মৃত্যুঞ্জয়ী কানাইলাল

"There shall be no appeal"

"আপিল করা হইবে না।"

—কানাইলাল।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে প্রণীত

কিশোর-সঙ্ঘ, চন্দননগর।
কোজাগরী পূর্ণিমা, ১৩৫২

প্রকাশক—গ্রন্থকার শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে
ধাড়াপাড়া
চন্দননগর।

মুদ্রাকর—শ্রীদীপক কুমার চ্যাটার্জী
দি নিউ এজ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
বড়বাজার
চন্দননগর।

মূল্য—১'৫০ নঃপঃ

উৎসর্গ ও স্বীকৃতি

যে ক্ষণজন্মা যুবকের আত্মোৎসর্গ এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু, তাঁহার উদ্দেশে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করিয়া তাঁহার আত্মাকেই এই গ্রন্থ উৎসর্গ করিলাম।

পুস্তক প্রকাশ বি ।যে সকল দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্য করিতে হয় তাহাতে অনভিজ্ঞ. .র ফলে পুস্তকখানি ছাপাখানা হইতে নির্দোষ-রূপে বাহির হইতে পারে নাই। এই দোষের জন্য পাঠকগণের নিকট ক্ষমা চাহিতেছি।

পুস্তক প্রকাশ বিষয়ে বন্ধুবর শ্রীগদাধর কোলের উৎসাহের জন্য, আমার কতিপয় ছাত্রবন্ধুদের সাহায্যের জন্য এবং প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ হইতে শ্রদ্ধেয় মতিলাল রায়ের ছবির ব্লকখানি ব্যবহার করিতে পাওয়ার জন্য আমি তাঁহাদের সকলের নিকট বাধিত রহিলাম।

গ্রন্থকার

কানাইলালের কার্য্য সম্বন্ধে তদানীন্তন শাসন বিভাগের উক্তি।

The murder of Narendranath Gossain which was committed by persons actually in custody in one of His Majesty's prisons is unique in the history of Bengal.

Bengal administration Report 1908–9

রাজ-কারাগারে অবরুদ্ধ অবস্থায় অবস্থিত ব্যক্তিগণদ্বারা সম্পাদিত নরেন্দ্রনাথ গোঁসাইএর হত্যা বাংলার ইতিহাসে এক অপূর্ব বিস্ময়কর ঘটনা।

উদ্‌বোধন

'উদ্যমেন হি সিদ্ধ্যন্তি কার্য্যানি ন মনরথৈঃ।'

"আত্মরক্ষার্থ ও পরের রক্ষার্থে যুদ্ধ ধর্ম, আত্মরক্ষার্থ বা পরের রক্ষার্থে যুদ্ধ না করা অধর্ম। আমরা বাঙ্গালী জাতি শত শত বর্ষ সেই অধর্মের ফল ভোগ করিতেছি।" (বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)

"শারীরিক বলই বাহুবল নহে। উদ্যম, ঐক্য, সাহস এবং অধ্যবসায় এই চারিটি একত্র করিয়া শারীরিক বল ব্যবহার করার যে ফল তাহাই বাহুবল। যে জাতির উদ্যম, ঐক্য, সাহস এবং অধ্যবসায় আছে, তাহাদের শারীরিক বল যেমনই হউক না কেন, তাহাদের বাহুবল আছে।

বেগবান অভিলাষ হৃদয়মধ্যে থাকিলেই উদ্যম জন্মে না। যখন অভিলাষ এরূপ বেগলাভ করে যে তাহার অপূর্ণাবস্থা বিশেষ ক্লেশকর হয়, তখন অভিলষিতের প্রাপ্তির জন্য উদ্যম জন্মে। যখন বাঙ্গালীর হৃদয়ে সেই এক অভিলাষ জাগরিত হইতে থাকিবে, যখন বাঙ্গালী মাত্রেরই হৃদয়ে সেই অভিলাষের বেগ এরূপ গুরুতর হইবে যে সকল বাঙ্গালীই তজ্জন্য আলস্যসুখ তুচ্ছ বোধ করিবে, তখন উদ্যমের সঙ্গে ঐক্য মিলিত হইবে।

সাহসের জন্য আরও একটু চাই। এই চাই যে জাতীয় সুখের অভিলাষ যখন আরও প্রবলতর হইবে—এত প্রবল হইবে যে তজ্জন্য প্রাণ বিসর্জ্জনও শ্রেয়োবোধ হইবে—তখন সাহস হইবে। যদি এই বেগবান অভিলাষ কিছুদিন স্থায়ী হয়, তবে অধ্যবসায়ও জন্মিবে। অতএব যদি কখনও (১) বাঙ্গালীর কোন জাতীয় সুখের অভিলাষ প্রবল হয়, (২) যদি বাঙ্গালী মাত্রেরই হৃদয়ে সেই অভিলাষ প্রবল হয়, (৩) যদি সেই প্রবলতা এরূপ হয় যে, তদর্থে লোক প্রাণপণ করিতে

প্রস্তুত হয়, (৪) যদি সেই অভিলাষের বল স্থায়ী হয়— তবে বাঙ্গালীর অবশ্যই বাহুবল হইবে। বাঙ্গালীর এরূপ মানসিক অবস্থা যে কখনও ঘটিবে না, একথা বলিতে পারা যায় না। যে কোন সময়ই ঘটিতে পারে।"

(বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)

সঙ্কেত

"India should have her own solution of political problems and can have it if she be vital enough to really will to achieve it."

Is India civilized? —Sir John woodroffe.

"নিজস্ব পথে ভারতবর্ষকে তাহার রাজনীতিক সমস্যাগুলির সমাধান পাইতে হইবে এবং উহা পাইবার জন্য যদি সে তাহার সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হয়, তাহা হইলে নিশ্চিতরূপে সে তাহা পাইতে পারিবে।"

(ভারতবর্ষ কি সভ্য ?— সার জন উড্‌রফ্‌)

পথ ?

১৯০৬ সালে রুশীয় প্রধান মন্ত্রী ষ্ট্যালিপিনের বাগান বাড়ীতে রুশীয় বিপ্লবকারীরা বোমা ফেলিয়া যখন কতকগুলি লোকের জীবন নাশ করিয়াছিল তখন "পাইওনিয়ার" লিখিয়াছিলেন—

"The horr or of such crimes is too great for words and yet it has to be acknowledged, almost, that they are the only method of fighting left to a people who are at war with despotic rulers able to command great military forces against which it is impossible for the unarmed populace to make a stand."

"এই সকল আইনবিরুদ্ধ কর্ম্মের ভীষণতা এত অধিক যে ভাষায় তাহা প্রকাশ করা যায় না ; কিন্তু ইহাও একরূপ স্বীকার করিতে হইবে যে, বিরাট সংগ্রাম-বাহিনীর অধিকারী যথেচ্ছাচারী শাসকদিগের বিরুদ্ধে নিরস্ত্র প্রজাদিগকে লড়িতে হইলে এইরূপ পন্থা অবলম্বন ব্যতীত অন্য কোন পন্থা নাই।"

সমসাময়িক হাওয়া

(প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৫)

পাশব বলের দ্বারা কার্য্যোদ্ধার হইবে না। কারণ পাশববলের বিরুদ্ধে পাশববল প্রয়োগে—ভয়ের বিরুদ্ধে ভয় প্রদর্শনে সমর্থ ও ইচ্ছুক একদল লোক দেখা দিয়াছে। ভীরুতা-অপবাদ-কলঙ্কিত বাঙ্গালীর শাসন রুশীয় প্রথায় পরিচালিত হওয়ায়, এক ক্ষুদ্র দল রুশীয় রকমে তাহার জবাব দিতেছে। তাহারা নির্ভীক. মরিতে প্রস্তুত, সুতরাং রুশীয় শাসনপ্রথা ভারতে প্রবলতর ও বিস্তৃততর হইলে তাহার জবাবও ভীষণতর হওয়া অসম্ভব নহে।

ক্ষুদিরামের ফাঁসী

(প্রবাসী, ভাদ্র, ১৩১৫)

ক্ষুদিরামের জীবনলীলা সাঙ্গ হইল। আমরা তাহার বিচারক হইবার অযোগ্য। কারণ তাহার কার্য্য ধর্ম্মবিরুদ্ধ হইলেও, তাহার হৃদয়ে দেশভক্তি উৎকট বিদেশী দ্বেষে পরিণত হইলেও, ইহা সত্য যে দেশভক্তি যেমন করিয়া তাহাকে গ্রাস করিয়াছিল উহা তেমন করিয়া আমাদিগকে গ্রাস করে নাই। তাহার জীবন যেমনই হউক, সে মরিয়াছে বীরের মত।

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা

নিবেদন

বিশ্ববন্দ্য কানাইলাল দত্তের জীবন-কথা লিখিয়া আমি তাহা সসঙ্কোচে প্রকাশ করিলাম। কানাইলালের জীবন-কথা বলিতে যাইয়া আমি যে সকল বিষয়ের অবতারণা করিয়াছি তাহা প্রাসঙ্গিক বোধ করিয়াই করিয়াছি। পুস্তকখানি পাঠ কয়িয়া যদি কোন পাঠক আমাকে কিছু জানানো আবশ্যক মনে করেন, তবে তাহা আমাকে জানাইলে আমি কৃতজ্ঞচিত্তে তাহা বরণ করিয়া লইব।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে

গ্রন্থপ্রকাশ
খৃষ্টাব্দ—১৯৬২

চিত্র পরিচয়

১। কানাইলাল দত্ত। গ্রন্থ-চরিত্র। আদর্শ বাঙ্গালী যুবক। ত্যাগ মহিমায় সমুজ্জ্বল দেশমাতৃকার বরেণ্য সন্তান। তন্তুবায়।

২। চারুচন্দ্র রায়। জন্ম ২রা সেপ্টেম্বর ১৮৬৯, মৃত্যু ২৮শে জানুয়ারী ১৯৪৫। গুণশীল, চরিত্রবান ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন সুপুরুষ। দ্বিপত্নীক পিতার প্রথমা পত্নীর পুত্র। এলাহাবাদ ইউনিভার্সিটীর এম.এ.। জন্মস্থান চন্দননগর। তিন পুত্র ও তিন কন্যার পিতা। বাংলা ও ইংরাজি ভাষায় সুদক্ষ লেখক। সম্মানলোভবিরাগী। ইংরাজি সাহিত্য ও লজিকের সুনিপুণ অধ্যাপক। সুদক্ষ শিকারী। বৈদ্য।

৩। মতিলাল রায়। জন্ম ৬ই জানুয়ারী ১৮৮২, মৃত্যু ১০ই এপ্রিল ১৯৫৯। জন্মস্থান চন্দননগর। বহু বিপ্লব-পথযাত্রীর আশ্রয়দাতা। প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা। সঙ্ঘে ভগবান আখ্যায় আখ্যাত। রূপবান। বিবাহিত। অল্পবয়সে মৃতা এক কন্যার পিতা। স্ত্রী রাধারাণী দেবী সঙ্ঘজননী পদবৃতা। ছেত্রী।

৪। পূর্ণচন্দ্র দে। গ্রন্থকার। জন্মস্থান চন্দননগর। জন্ম ৯ই মার্চ্চ ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ।

৫। শ্রীশচন্দ্র ঘোষ। জন্ম ১৮৮৬ (?) খৃষ্টাব্দ, মৃত্যু ২রা মে ১৯৪১। জন্মস্থান—বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত সুবলদহ গ্রাম। চন্দননগর বাগবাজার অঞ্চলে অবস্থিত তাঁহার খুল্লতাতের গৃহাশ্রিত। উচ্চশ্রেণীর দেশকর্ম্মী। ৫৫ বৎসর বয়সে বিকৃত-মস্তিস্ক অবস্থায় আত্মহত্যাকারী। কায়স্থ। কৃষ্ণকায়।

৬। বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। জন্ম ৫ই নভেম্বর ১৮৮৬। চারি পুত্র ও চারি কন্যার পিতা। আত্ম-পরান্মুখ দেশকর্ম্মী। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনকারী বিপ্লবীদের চন্দননগরে থাকিবার ব্যবস্থাকারী। কৃতী লেখক। সাম্যভাবভাবী।

——

কানাইলাল

(৩১শে আগষ্ট, ১৯০৮)

বীর কানাইলালের কীর্ত্তিকথায় বঙ্গের প্রতি গৃহ মুখরিত ও আমোদিত। আপন দলের তথা দেশের বিশ্বাসঘাতকের জীবনান্তকর দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়া এবং সেই ব্যবস্থার লক্ষ্যীভূত কার্য্যটি কৃতকার্য্যতার সহিত সম্পাদন করিয়া কানাইলাল ইহলোক হইতে বিদায় লইয়াছেন। তাঁহার এই কর্ম্মের প্রেরণার ভাব তাঁহার সম্পূর্ণ নিজস্ব না হইলেও, তিনি তাঁহার কর্ম্মের প্রতি যে ষোল আনা আত্ম-নিবেদন দেখাইয়া গিয়াছেন তাহা তাঁহার নিজস্ব। ভারতের উপর বিদেশী শাসনের ভিত্তি শিথিল করিবার চেষ্টা বহু পূর্ব্ব হইতে চলিয়া আসিতেছিল ইহা যেমন সত্য, তেমনই ইহাও সত্য যে কানাইলাল যে হাওয়ার মধ্যে থাকিয়া নিজ কর্ম্ম বাছিয়া লইয়াছিলেন, তাহা ভারতের স্বাধীনতা-যজ্ঞ-সম্পাদনের জন্য একটি বিশেষভাবে সৃষ্ট হাওয়া। দেশে বিপ্লবাত্মক ঘোরতর অশান্তির সৃষ্টি করিয়া শাসকবর্গকে বিচলিত ও আত্মস্থ করিতে এই প্রচেষ্টা যেমন সমর্থ হইয়াছিল, তেমন আর অন্য কিছুতেই সম্ভবপর হয় নাই। ব্রিটিশ শাসক-বর্গকে তাঁহাদিগের দ্বারা সম্পাদিত বঙ্গভঙ্গ ব্যবস্থা প্রত্যাহার করিতে বাধ্য করিবার জন্য স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার ও ব্রিটিশ পণ্য বর্জ্জন আন্দোলন যখন প্রবলভাবে দেশে চলিতে লাগিল এবং এই আন্দোলনের সহিত যখন বঙ্গদেশের আকাশ-বাতাস ঋষি

বঙ্কিমচন্দ্র প্রদত্ত "বন্দেমাতরম" মন্ত্রে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল, তখন শাসকবর্গ অত্যধিক চঞ্চল হইয়া আর মাথা ঠিক রাখিতে না পারিয়া সকল রকম দমননীতির আশ্রয় লইলেন। শাসকবর্গের দমননীতি ব্যর্থ করিবার জন্য বীর বারীন্দ্রকুমার ঘোষ তাঁহার সহকর্ম্মীদের সহিত কলিকাতায় মুরারীপুকুর বাগানে (৩২ নং মুরারীপুকুর রোডে) যে নরমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন সেই যজ্ঞের আহ্বানে তাঁহার সহকর্ম্মী হইয়া সেই যজ্ঞাগ্নিতেই কানাইলাল আত্মদান করিয়া গিয়াছেন। এই অগ্নি হইতে জীবিতাবস্থায় অনেকে বাহির হইতে পারিলেও কানাইলাল ও আরও কয়েকজনকে আমরা সে অবস্থায় দেখিতে পাইলাম না। আরব্ধ কর্ম্মের প্রতি কানাইলালের অগাধ বিশ্বাস ছিল এবং তাঁহাদের মধ্যে যখন একজন বাঁচিয়া থাকিবার অত্যধিক আকাঙ্ক্ষায় ভ্রান্ত বিপরীত বুদ্ধির আশ্রয় লইল, তখন তাহার ভবলীলা সাঙ্গ করিবার জন্য কানাইলাল অতি মাত্রায় ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন এবং সেই ব্যগ্রতার ফলে কলিকাতার আলিপুর জেলে ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে ৩১শে আগষ্ট তারিখে কানাইলাল গোঁসাই বধ করিয়া যে অপূর্ব্ব বিস্ময়কর কাণ্ডের বাস্তব অভিনয় করিলেন তাহা বিশ্ববাসীর বিস্ময় উৎপাদন না করিয়া থাকিতে পারিল না। ফ্রান্সের ইতিহাসে ১৪ই জুলাই যেমন একটি প্রধানতম স্মরণীয় দিন, বঙ্গদেশের তথা ভারতের ইতিহাসে ঠিক তেমনই স্মরণীয় দিন এই ৩১শে আগষ্ট।

দেশে জাতীয় ভাবের ক্রমবিকাশ ও কানাইলাল

রাষ্ট্রনীতিক জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে ভারত যে ক্রম অবলম্বন করিয়া বর্ত্তমানে আসিয়া পহুঁছিয়াছে তাহা খুব সংক্ষেপে আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, আমরা বর্ত্তমানে যে-স্বাধীনতা ভোগ করিতেছি ঠিক তাহাই অর্জ্জন করিবার জন্য দেশকর্ম্মীরা কঠোর পরিশ্রম ও আত্মদান করিয়া যান নাই। যে-সর্ত্তে ইংরাজ ভারত ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন তাহা যে ভারতের পক্ষে নিছক শুভফল প্রদান করিতে পারিবে না তাহা নিশ্চিত। কিন্তু মানুষের কর্ম্মের পশ্চাতে যে দৈবী শক্তি কার্য্য করিয়া থাকে, তাহা যদি কোনকালে ভারতের প্রতি একেবারে সুপ্রসন্ন হয় তাহা হইলে ভারতের পক্ষে ইংরাজের ভারত পরিত্যাগ সকল দিক দিয়া কল্যাণপ্রসূ হইলেও হইতে পারে।

বঙ্গভঙ্গ-প্রতিরোধ আন্দোলন অবলম্বন করিয়া দেশের মধ্যে যে স্বাদেশিকতা ও বিলাতীপণ্য বর্জ্জন আন্দোলনের প্রবল জোয়ার আসিয়াছিল সেই আন্দোলনের জোয়ারকে বঙ্গের বাহিরের তাৎকালীন নেতৃবৃন্দ বঙ্গদেশেই আবদ্ধ রাখিবার প্রস্তাব ভারতের জাতীয় কংগ্রেসে গ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু সে প্রস্তাবরূপী প্রবাহ নিজ বেগে প্রস্তাবগণ্ডী অতিক্রম করিয়া সারা ভারতে প্রবহমান হইয়াছিল। এই আন্দোলন যে উদ্দেশ্যে আরব্ধ হইয়াছিল, পরে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল বটে অর্থাৎ পরে ভগ্ন বঙ্গ

জোড়া লাগিল বটে, কিন্তু ভারতে স্বাদেশিকতার যে মহাতরঙ্গ সৃষ্ট হইয়াছিল তাহা পূর্ণ জোয়ারে পরিণত হইয়া একেবারে তাহাকে অপূর্ব্ব তেজস্বিতার উন্মাদনায় পূর্ণ করিয়াছিল।

কবি নবীনচন্দ্র একদিন বাঙ্গালীকে তিরস্কার করিয়া বলিয়াছিলেন—

সাধে কি বাঙ্গালী মোরা চির-পরাধীন ?
সাধে কি বিদেশী আসি দলি পদভরে
কেড়ে লয় সিংহাসন ? করে প্রতিদিন
অপমান শত, চক্ষের উপরে ?
স্বর্গ মর্ত্ত্য করে যদি স্থান বিনিময়,
তথাপি বাঙ্গালী নাহি হবে একমত ;
প্রতিজ্ঞায় কল্পতরু, সাহসে দুর্জ্জয় !
কার্য্যকালে খোঁজে সবে নিজ নিজ পথ !

কবি বড় দুঃখেই এই কথাগুলি বলিয়া বাঙ্গালীকে ধিক্কার দিয়াছিলেন। কিন্তু পরে বাঙ্গালী—শুধু বাঙ্গালী কেন, সমগ্র ভারতবাসী আর খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত হইয়া নির্বীর্য্যের মত থাকিতে চাহে নাই। তবে সেজন্য অমর বীর্য্যবন্ত "বন্দেমাতরম্"-মন্ত্রদাতা ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রকেও ভারতের স্বাধীনতার জন্য "ধুঁয়ার ছলনা" ধরিয়া কত কাঁদিয়া যাইতে হইয়াছে। তাঁহার মুখ হইতে দেশবাসীর মুখে জীবন্তভাবে "বন্দেমাতরম্" মন্ত্র উচ্চারিত হইতে কিছু সময় লাগিয়াছিল সত্য, কিন্তু ইহাও সত্য যে এই মন্ত্র দেশময় সাজ-সাজ ভাব আনিয়া দিয়াছিল। বহু পূর্ব্ব হইতে ভারতসেবক স্যার রমেশচন্দ্র

দত্ত ও মহামতি গোখেল নানা তথ্যাদি সংকলন করিয়া বৃটিশ জাতিকে বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন যে, ব্রিটিশ শাসকবর্গ যে নীতিতে ভারত শাসন করিয়া চলিতেছেন তাহা শুধু ভারতের কেন ইংলণ্ডের পক্ষেও আদৌ শুভফলপ্রদ নহে। ইহার উপর যেদিন ভারতীয় কংগ্রেসের দ্বাবিংশতিতম অধিবেশনের সভাপতি দাদাভাই নওরোজি তাঁহার অভিভাষণে সার হেনরী ক্যাম্পবেল ব্যানারম্যানের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া তারস্বরে ঘোষণা করিলেন যে "শাসন ব্যবস্থা যতই ভাল হউক না কেন, তাহা স্বায়ত্ব-শাসনের স্থান গ্রহণ করিতে পারে না", সেইদিন ভারত এবং ইংলণ্ডের একসঙ্গেই চমক ভাঙ্গিল। সুরেন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র, বালগঙ্গাধর তিলক ও লালা লাজপত রায় প্রভৃতি দেশনেতৃগণকে ভারতে জাতীয় ভাব আনিবার জন্য কঠিন পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। বিপিনচন্দ্রের নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধই পরে মহাত্মা গান্ধীর বিশাল সত্যাগ্রহ আন্দোলনে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। কিন্তু যখন রাষ্ট্রনীতিক ক্ষেত্রে শ্রীঅরবিন্দের প্রত্যক্ষ আগমন ঘটিল তখনই জাতীয়তা আন্দোলন এক আশ্চর্য্যজনক মনোমুগ্ধকর রূপ ধারণ করিল।

আত্মশক্তি-উপলব্ধির পথে যেমন ভারতবর্ষ ক্রমেক্রমে অগ্রসর হইতেছিল, তেমনই ঈশ্বর-করুণা আসিয়া যেন হঠাৎ বাঙ্গালীকে তথা ভারতবাসীকে একেবারে সচেতন করিয়া তুলিয়াছিল। পরে বাঙ্গালী যেপথ অবলম্বন করিয়া যশস্বী হইয়াছেন সেপথ যদি শ্রেয়ের পথ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে, তাহা হইলে

নিশ্চয়ই বলা যাইতে পারে যে তদানীন্তন সময়ে দুর্জ্জন (!) লর্ড কার্জ্জনের মত বাঙ্গলার তথা ভারতের মঙ্গল আর কেহ করেন নাই। এই লর্ড কার্জ্জনের সময় হইতেই প্রকৃতপক্ষে ভারত ইংরাজের হাতছাড়া হইতে আরম্ভ হয়। লর্ড কার্জ্জন কর্ত্তৃক বিভক্ত বঙ্গের পুনর্মিলন বাঙ্গালীর তথা ভারতবাসীর শক্তির সমক্ষে ইংরাজের প্রথম নতিস্বীকার। তাই ভারতবর্ষ হইতে লর্ড কার্জ্জনের বিদায় কালে "স্টেট্স্ম্যান" যে সুচিন্তিত অকপট মন্তব্য করিয়াছিলেন তাহা চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবার যোগ্য।

"স্টেট্স্ম্যান" লিখিয়াছিলেন—

"And yet no Viceroy has done one tithe of what Lord Curzon has done to create, to quicken and to consolidate the forces that will mould the New India of tomorrow. Of Lord Curzon, as of many another powerful and indispensable person in the history of the Nations, it may yet have to be written—he moulded better than he knew."

"এবং ইহাও স্বীকার্য্য যে ভবিষ্যৎ নবভারত গঠনোপযোগী শক্তিসমূহকে উদ্বোধিত, গতিশীল ও সুদৃঢ় ঐক্যবদ্ধ করিয়া লর্ড কার্জ্জন যাহা করিয়া গেলেন তাহার দশভাগের একভাগও অন্য কোন ভাইসরয় করিয়া যান নাই। জাতি সমূহের ইতিহাসে অন্য বহু শক্তিমান ও অপরিহার্য্য ব্যক্তি সম্বন্ধে যাহা প্রযোজ্য তাহা লর্ড কার্জ্জনের সম্বন্ধেও হয়ত পরে লিখিত হইবে—তিনি

যেভাবে গঠন করিতে চাহিয়াছিলেন অজ্ঞাতসারে তিনি তদপেক্ষা প্রকৃষ্টতরভাবে গঠন করিয়া গিয়াছেন।"

কিন্তু ইংরাজ শাসকবর্গকে আত্মস্থ করিবার জন্য যে নিদারুণ পথ বাঙ্গালী কর্ত্তৃক পরে আবিষ্কৃত ও অবলম্বিত হইয়াছিল, সেই নিদারুণ পথের যাঁহারা যাত্রী হইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম শ্রদ্ধেয় যাত্রী কানাইলাল দত্ত।

কিন্তু এই পথের আবিষ্কর্ত্তা বাঙ্গালী হইলেও, ভারতের ইতিহাসে এ পথের প্রেরণা বিদ্যমান ছিল। এই প্রেরণাগ্নি প্রথমে প্রজ্বলিত হয় মহারাষ্ট্রে ১৮৯৭ সালে। এই সালে পুনায় যে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয় তাহাতে ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ড উভয় দেশেই সমধিক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। বোম্বাইএ ভীষণ বিউবনিক মহামারি **(plague)** দেখা দিয়াছিল। বোম্বাইএর ইংরাজ শাসকবৃন্দ ও ইংরাজ অধিবাসীরা যাহাতে এই মড়কের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে কর্ত্তৃপক্ষ দেশে প্রতিবিধানমূলক নানারূপ অত্যধিক কড়া শাসন ব্যবস্থা চালু করেন। কর্ত্তৃপক্ষের এই ব্যবস্থাগুলি ভারতবাসীর প্রতি ইংরাজের দারুণ অত্যাচার বলিয়া দেশবাসী গ্রহণ করে এবং প্রতিবাদস্বরূপ কোন সুষ্ঠু উপায় দেখিতে না পাইয়া অত্যাচারীকে গুরু আঘাত দিবার চেষ্টায় দুইজন মহারাষ্ট্রবাসী র‍্যাণ্ড সাহেব এবং তাহার সহিত আয়ারাষ্ট সাহেবের প্রতি গুপ্ত-ভাবে গুলি চালাইয়া তাঁহাদিগের প্রাণ সংহার করেন। দুই জনে গুপ্ত থাকিয়া দুইটি গুলি ছুঁড়িয়াছিল। একটি র‍্যাণ্ড সাহেবের

পৃষ্ঠ বিদ্ধ করিয়াছিল এবং অপরটি আয়ারাষ্ট সাহেবের মস্তক বিদ্ধ করিয়াছিল। আয়ারাষ্ট সাহেব ভুলক্রমে নিহত হইয়াছিলেন। হত্যাকারীদের ধরিবার জন্য কুড়ি হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষিত হইয়াছিল; কিন্তু হত্যাকারীদের সন্ধান খুব সহজে পাওয়া যায় নাই। পরে হত্যাকারীগণ ধৃত হইয়া বিচারে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়। আমাদের কানাইলাল এই প্লেগের সময় বোম্বাইএ ছিলেন। তখন তাঁহার বয়স ৯।১০ বৎসর।

ভারতবাসীকে চিরদিন পরাধীন করিয়া রাখিবার জন্য ইংরাজ শাসকগণ ভারতবর্ষে অস্ত্র আইনের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। অস্ত্রহীনকে অস্ত্রদ্বারা দাবাইয়া রাখা যে খুব সহজ তাহা না বলিলেও চলে। গুপ্ত বা প্রকাশ্য-ভাবে রিভলবার বা অনুরূপ কোন অস্ত্র প্রস্তুত বা যোগাড় করা সামান্য ব্যাপার নহে। অস্ত্রবান্‌কে আক্রমনের জন্য বিজ্ঞান অস্ত্রহীনের হস্তে বোমা আনিয়া দেয়। বোমা অতি সহজে প্রস্তুত করিতে পারা যায় বলিয়া বাঙ্গালার বিপ্লববাদীগণ বোমারই আশ্রয় লইয়া তাঁহাদের উদ্দেশ্য সাধনের পথে অগ্রসর হইলেন। বোমা প্রস্তুতকরণের প্রধান কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইল ৩২ নং মুরারিপুকুর গার্ডেনরি রোডে। এই বোমার কারখানার সহিত সম্পর্কিত হইয়া কানাইলাল ৪নং গোপীমোহন দত্ত লেনে অবস্থান করিতে-ছিলেন। মুরারিপুকুর বাগান খানাতল্লাসি হইয়া যাঁহারা

ধরা পড়িলেন তাঁহাদের সহিত গোপীমোহন দত্ত লেন হইতে কানাইলালও ধৃত হইলেন। তাহার পর যে কয় মাস তিনি জীবিত ছিলেন আলিপুর জেলেই তাঁহার অবস্থান হইয়াছিল। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের উচ্ছেদ কামনায় ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে অন্যতম হইয়া কানাইলাল ধরা পড়িয়াছিলেন, কিন্তু সে বিচার শেষ না হইবার পূর্ব্বে নরেন্দ্রনাথ গোস্বামীকে জেলখানার ভিতর নিহত করিয়া হত্যাপরাধে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া তিনি ফাঁসীকাষ্ঠে ঝুলিয়া ইহধাম পরিত্যাগ করেন।

কানাইলালের জন্ম এবং তাঁহার বাল্য ও ছাত্রজীবন।

কানাইলালের কীর্ত্তি আকাশচুম্বী। কিন্তু তাঁহাকে ২১ বৎসর বয়সেই ইহলোক পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে, সুতরাং তাঁহার জীবন-কথা খুবই সংক্ষিপ্ত।

কানাইলালের জন্ম হয় ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ৩০শে আগষ্ট তারিখের প্রাতে ৫টার সময় অথবা ১২৯৫ বঙ্গাব্দের ১৪ই ভাদ্র ভোর ৫টার সময়। সুতরাং তাঁহার জন্মদিবস ইংরাজী মতে বৃহস্পতিবার এবং বাংলা মতে বুধবার। তখন তাঁহার পিতা চুণীলাল দত্তের এবং তাঁহার মাতা ব্রজমণি দাসীর বয়স যথাক্রমে ৩৩ এবং ২৬ বৎসর। চন্দননগরের জন্ম মৃত্যু লিখাইবার অফিসে কানাইলালের নাম কানাইলালই লিখান হইয়াছিল। কানাইলালের জন্ম দিবস শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথি দিবস কৃষ্ণাষ্টমী। কানাইলালের জন্ম হয় তাঁহার মাতুলালয়ে। এই বাটী চন্দননগর বোড় সাকিমের সরিষাপাড়া লেন ও গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোডের সংযোগ-স্থলে অবস্থিত। এই বাটী দুইভাগে বিভক্ত। একটি ভাগ দ্বিতল বহির্বাটী (এখন একতলা)—যাহা বাটীর পশ্চিমাংশ। অন্দর বাটীটি কানাইলালের মাতামহ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। এবং বাটীর অন্দর মহল অংশের একটি কক্ষে কানাইলাল

জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার মাতামহের নাম সূর্য্য-কুমার দত্ত। কানাইলালের পিতা পিতামহের দেশ হুগলী জেলার অন্তর্গত খরসরা-বেগমপুর। কানাইলালরা দুই ভাই এবং পাঁচ ভগিনী। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীআশুতোষ দত্ত বোম্বাই ইউনিভার্সিটির এল, এম, এস ডাক্তার। তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী। প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের ৺মতিলাল রায় এবং শ্রীব্রজবিহারী বর্ম্মন দুই জনেই "কানাইলাল" গ্রন্থে লিখিয়াছেন--কানাইলাল ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহা ঠিক নহে। বোধ হয় ৺মতিলাল রায় অনুমান করিয়া লিখিয়াছিলেন এবং শ্রীব্রজবিহারী বর্ম্মন হয়ত ৺মতিলাল রায়ের পুস্তক হইতে ইহা সংগ্রহ করিয়া থাকিবেন। ভাদ্র মাসের কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম রাখা হইয়াছিল 'কানাই'—এইরূপ অনুমান করিলে, মনে হয়, অনু-মানের সীমা লঙ্ঘন করা হইবে না। এই স্থানে উল্লেখ থাকা আবশ্যক মনে করি যে, কানাইলালের মাতুলালয়ের বর্হিবাটীর উত্তর পশ্চিম কোণে অবস্থিত একটি কক্ষের বহির্গাত্রে যে প্রস্তর ফলক স্থাপিত হইয়াছে তাহাতে কানাই-লাল সম্বন্ধে যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ উৎকীর্ণ হইয়াছে তাহার লেখা সম্বন্ধে সাবধানতা অবলম্বন করা হয় নাই। উহাতে লিখিত হইয়াছে—এই গৃহে কানাইলাল জন্মগ্রহণ করিয়া-ছিলেন। তর্ক করিলে, লেখক গৃহের আভিধানিক অর্থ লইয়া উহা বাটীর প্রতিশব্দ বলিয়া তর্কে জিতিবার চেষ্টা

করিবেন, কিন্তু বাঙ্গালী সাধারণ গৃহ অর্থে অধিকাংশ স্থলে ঘর অর্থাৎ কক্ষ বুঝিয়া থাকেন। কানাইলালেব জন্ম হইয়াছিল তাঁহার মাতুলালয়ের পূর্ব্বাংশ ভাগে অবস্থিত একটি কক্ষে। কানাইলালের ছোট মামী বলেন যে কানাইএর মাতামহ কানাইকে কান্‌হাইয়ালাল বলিয়া ডাকিতে বড় ভালবাসিতেন। কানাই নামটি বোধ হয় কানাইএর মাতার মনোমত হয় নাই, তাই তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র আশুতোষের নামের অনুরণন রক্ষা করিয়া কানাইএর নাম "সর্ব্বতোষ" রাখিয়াছিলেন। এই নাম চালু হয় নাই বটে, কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে যে কানাই তাঁহার কার্য্যদ্বারা সকলকে বিস্মিত ও চমৎকৃত করিয়া "সর্ব্বতোষ" নাম ধারণের উপযুক্তই হইয়াছেন। ৺মতিলাল রায় তাঁহার "কানাইলাল" গ্রন্থে লিখিয়াছেন "কানাই জন্মাষ্টমী তিথিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া কানাই কানাই।" তাহা না বলিয়া ইহা বলিলেই ঠিক হইবে যে কানাই জন্মাষ্টমী তিথিতে জন্মগ্রহণ করিয়া জন্মাষ্টমী তিথির মর্য্যাদা আরও বাড়াইয়া দিয়া গিয়াছেন। ৺মতিলাল রায় আরও লিখিয়াছেন যে কানাইএর সর্ব্বতোষ নামটি সূতিকাগারের বাহিরে পৌঁছায় নাই। আমি যাহা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। তাহা হইতে এই কথা বলিলে ঠিকই বলা হইবে যে, সূতিকাগারে অবস্থান-কালে কানাইএর নাম ছিল "কানাই", "সর্ব্বতোষ" ছিল না।

কানাইএর গায়ের রং মাঝামাঝি ছিল—ফরসাও নয়, কালোও নয়। হাত দুখানি ঈষৎ লম্বা ছিল এবং পায়ের পাতা দুখানি বেশ দীর্ঘ ছিল। তাঁহার পায়ের জুতা সহজে সংগ্রহ করা সম্ভব হইত না। ঠোঁট দুইটি ছিল পুরু, মাতার নিকট হইতে প্রাপ্য। কানাইএর মাতা লিখিতে পড়িতে জানিতেন। পিতা বেশ ইংরাজি লিখিতে জানিতেন। পিতার লেখার নমুনা হিসাবে কানাইএর পড়াশুনার ফলের পরিচয়-পুস্তকের একস্থানের তাঁহার একটি লেখা উদ্ধৃত করিতেছি। কানাইএর ক্লাস-শিক্ষক কানাইএর পড়াশুনা সম্বন্ধে একবার ভাল রিপোর্ট দিতে না পারিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছিলেন—"Does not work properly" কানাইএর পিতা তদুত্তরে লিখিয়াছিলেন—"Noted. Endeavour will be made to obtain a favourable report." ইহা ১৯০০ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসের কথা।

কানাইলালের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্য্যায়ের শিক্ষা বোম্বাইএ হইয়াছিল। বোম্বাইএ গিরগাঁওএ অবস্থিত "আরিয়ান এডুকেশন সোসাইটি" কর্তৃক পরিচালিত হাইস্কুলে তিনি অধ্যয়ন করেন। পড়াশুনার মান একেবারে খুব উচ্চ শ্রেণীর না হইলেও ভালই ছিল। ১৯০১ সালের একটি পরীক্ষায় ইংরাজীতে ১২৫ এর মধ্যে ৩৮½, ফরাসীতে ১০০র মধ্যে ৪৯, অঙ্কে ১০০র মধ্যে ৫১, ইতিহাস ও ভূগোলে ৭৫র মধ্যে ৩৯½, এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্যে ৭৫র মধ্যে ৩৭ পাইয়াছিলেন। ছাত্রা-

বস্থায় মোটের উপর শান্তশিষ্ট থাকিলেও কানাইএর মনে যে দুষ্টামী স্থান পাইতনা এমন নহে। তাঁহার ক্লাসের লেখাপড়ার রিপোর্ট পুস্তকে তাঁহার ক্লাসের শিক্ষকের সই-এর পার্শ্বে তাঁহার ক্লাসের শিক্ষককে উদ্দেশ করিয়া তিনি লিখিয়াছিলেন—"You ! Ancient fool !"

কানাইলাল বোম্বাইএ শিক্ষার্থী অবস্থায় অবস্থানকালে দেশপ্রেম-উদ্বোধক সদ্ভাবের দ্বারা যে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়। তাঁহার ক্লাসের ক্যালেণ্ডার পুস্তকে কর্তৃপক্ষেরা ইংরাজ কবি মার্টিন লসের কবিতার একটি অংশ ছাপাইয়া উহার অন্তর্ভুক্ত আদর্শটি সকল ছাত্রের সামনে ধরিয়া রাখিয়াছিলেন। ক্যালেণ্ডার পুস্তকে সেই কবিতাটি ছাপানোর উদ্দেশ্য হইতেছে—প্রত্যেক ছাত্রকে লেখাপড়ার মাধ্যমে প্রকৃত দেশকর্ম্মী করিয়া তোলা। কবিতাটি এই —

Work, for it is a noble thing,
With a lofty end in view,
To tread the path that God ordains,
With steadfast heart and true,
That will not quail, whate'er betide,
But bravely bear us through.
It matters not what the sphere may be,
That we are here to fill ;

How much there is of seeming good,
How much of seeming ill;
'Tis ours to bend the energies,
And consecrate the will.

কর্ম্মেতে রহিবে ব্রতী, তাতেই সম্মান,
সেই কাজ কর যার উদ্দেশ্য মহান;
ঈশ্বর-আদিষ্ট পথে সর্ব্বদা থাকিও,
অচল অটল চিত্তে সে পথে চলিও;
টলিবে না যেই চিত্ত কোন কিছুতেই,
নিঃশঙ্কে লইয়া যাবে সিদ্ধিপথে সেই।
কর্ম্মক্ষেত্র যাই হোক, কর্ম্মেরে বরিও,
ভাল মন্দ কূট তর্কে কভু না পড়িও;
সর্ব্বশক্তি নিয়োজিও কর্ম্মের সেবায়,
উৎসর্গ করিয়া দিও মন প্রাণ তায়।

পদগুলি যে কানাইএর খুব ভাল লাগিয়াছিল তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। তিনি পদগুলি তাঁহার পাঠের দিন-পঞ্জিকা পুস্তকে একাধিক স্থানে লিখিয়া যেন মন্ত্র করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া কাউপারের "টাইম পিস্" কবিতা হইতে একটি ছত্র — যে ছত্রটি দেশ প্রেমের পূর্ণ উদ্বোধক— তাহাও কানাইলাল ক্যালেণ্ডার পুস্তকে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। সেছত্রটি হইতেছে—"England, with all thy faults, I love thee still." "জন্মভূমি দোষসম্পন্ন হইলেও সকল

সময়েই ভালবাসার পাত্র”। হৃদয়ে এই ভাবের পূর্ণ অধিষ্ঠান না হইলে ভালবাসার পাত্রের জন্য কি প্রাণোৎসর্গ করিতে পারা যায়!

১৯০৪ খৃষ্টাব্দে কানাইলাল বোম্বাই হইতে পিতা-মাতার সহিত চন্দননগরে তাঁহার মাতুলালয়ে আসেন এবং চন্দননগরে থাকিয়া “ডুপ্লেক্স” বিদ্যামন্দির (এখন যাহার নাম কানাইলাল বিদ্যামন্দির) হইতে এন্ট্রান্স এবং এফ. এ. পরীক্ষা দিয়া পাশ করেন। তিনি চুঁচুড়ায় অবস্থিত হুগলী কলেজে (এখন যাহার নাম মহসীন কলেজ) বি. এ. পড়েন এবং ইউনিভার্সিটির পরীক্ষা দিয়া পাশ করেন। পড়িবার সময় তিনি ইতিহাসে অনার্স লইয়াছিলেন, কিন্তু পরীক্ষা দিয়াছিলেন মাত্র পাশ কোর্সে -- ইংরাজি, দর্শন ও ইতিহাসে-এবং তাহাতেই তিনি পাশ করেন। পাশের সংবাদ যখন প্রকাশিত হয় তখন তিনি হত্যাপরাধে অভিযুক্ত, কারাগারে বন্দী। স্কুল বা কলেজের পড়ার ফলাফল বিচার করিয়া দেখিলে হয়ত তাহাতে এমন কোন বিশেষত্বের সন্ধান পাওয়া যায় না; কিন্তু কানাই যে মেধাবী ছাত্র ছিলেন সে বিষয়ে তাঁহার শিক্ষকেরা এবং তাঁহার বন্ধুগণ সকলেই একমত। কানাইলালের সহপাঠী চন্দননগরের হাটখোলা নিবাসী ডাক্তার শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঘোষের নিকট হইতে জানা গিয়াছে যে তাঁহাদের ক্লাসের শিক্ষক বা অধ্যাপক ৺চারুচন্দ্র রায় কানাইলালের ইংরাজী রচনা তাঁহার সহপাঠী-

দের সমক্ষে আদর্শ রচনা বলিয়া উহার প্রতি তাহাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতেন।

কানাইলাল একাদিক্রমে বহুক্ষণ ধরিয়া পড়িতে পারিতেন। বি. এ. পরীক্ষার সময় স্বদেশী আন্দোলনের পূর্ণ জোয়ার আসায় তিনি পড়া লইয়া বেশীক্ষণ থাকিতে পারিতেন না। বলা বাহুল্য, আত্মীয়েরা কানাইএর এই কার্য্যটি ভাল চক্ষে দেখিতেন না। তাঁহার সহোদর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীআশুতোষ দত্ত স্বর্গীয় চারুচন্দ্র রায়ের নিকট কানাই সম্বন্ধে অপ্রসন্ন উক্তি করিয়া দুঃখের সহিত বলিয়াছিলেন — কানাই পাশ-টাস করতে পারবে না, পড়াশুনা করেনা বল্লেই হয়। চারুবাবু আশুবাবুর এই কথার উত্তরে মাত্র ইহাই বলিয়াছিলেন—"একবার সব বইগুলি পড়িয়া লইতে পারিলেই সে পাশ করিবে।" কানাই গ্রন্থকারের একরূপ নিত্যসঙ্গী ছিলেন। গ্রন্থকার নিঃসন্দেহে একথা বলিতে পারেন যে, কানাই বাঁচিয়া থাকিলে বড় হইয়া একজন বিদ্বান, জ্ঞানবান ও কর্ম্মপ্রেমিক কর্ম্মীরূপে দেশনেতার আসন গ্রহণ করিতে সক্ষম হইতে পারিতেন। প্রচুর সুগন্ধে ভরা কানাই-পুষ্প সম্পূর্ণরূপে প্রস্ফুটিত হইতে না পাইয়া ঘটনাচক্রের আবর্ত্তনে পড়িয়া অকালে বিনাশপ্রাপ্ত হইল এবং স্বীয় অন্তর্নিহিত সমূহ সুগন্ধ দেশ মধ্যে পরিবেশন করিয়া যাইতে পাইল না।

কর্ম্মপ্রস্তুতি ও দেশচর্য্যা

দেশের কাজ করিতে এবং দেশের শত্রুর সহিত লড়িতে হইলে দৈহিক বল ও বীরত্ব এবং মানসিক বল ও বীরত্ব এই উভয় প্রকার বল ও বীরত্বেরই প্রয়োজন। চন্দননগরে যাঁহারা দেশ সেবায় উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন তাঁহারা যাহাতে এই উভয় প্রকার বলের অধিকারী হইতে পারেন তাহার জন্য সাধনা তাঁহারা আরম্ভ করিয়াছিলেন। কানাই-লালও যাহাতে এই সাধনায় সিদ্ধ হইতে পারেন তাহার চেষ্টায় মনোনিবেশ করেন। কানাইলাল হাটখোলা নিবাসী দেশ-সেবক ডাক্তার নগেন্দ্রনাথ ঘোষ এবং ফটকগোড়া নিবাসী শ্রীশচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি কয়েকজনের সহিত একবার পদব্রজে বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত গমন করেন এবং আর একবার বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত পদব্রজে যাইয়া ট্রেনে পরেশনাথ পর্য্যন্ত গমন করেন। এই কার্য্যদ্বারা সহ্যশক্তি অর্জন করা এবং ট্রেনের সাহায্য ব্যতিরেকে এক স্থান হইতে অন্যস্থান গমনে অভ্যস্থ হওয়াই ছিল তাঁহাদের লক্ষ্য।

চারুবাবুর ছাত্র ও অনুরক্ত বন্ধুগণ Paper chase (পেপার চেজ) খেলাটি খেলিতে বড় ভালবাসিতেন। এই ইংরাজী খেলাটি আমাদের "তেনা মান চলে" খেলার সমপর্য্যায়ভুক্ত। আক্রান্ত হইলে যাহাতে

কানাইলাল

আত্মরক্ষা করিতে এবং আবশ্যক হইলে শত্রুকে আক্রমণ করিয়া তাহাকে সায়েস্তা করিতে পারা যায়, তদুদ্দেশ্যে পাড়ায় পাড়ায় মুষ্টিযুদ্ধ ও লাঠিখেলা শিক্ষার আখড়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। মুষ্টিযুদ্ধ শিক্ষা করিবার প্রধান স্থান ছিল বাগবাজারস্থিত স্বর্গগত চারুচন্দ্র রায়ের বাটী এবং লাঠিখেলা শিক্ষা করিবার প্রধান স্থান ছিল কানাইলালের মাতুলের বাটীর সংলগ্ন প্রাচীরবেষ্টিত উদ্যান।

বন্দুক ছোঁড়ায় অভ্যস্থ করিবার জন্য স্বর্গীয় চারুচন্দ্র রায় কানাইলাল প্রভৃতি অনেককে শিকারে লইয়া যাইতেন এবং শিকার হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া মাষ্টার মহাশয় অর্থাৎ চারুচন্দ্র রায় তাঁহার সহধর্ম্মিনী দ্বারা শিকারলব্ধ পাখীপক্ষী রন্ধন করাইয়া উপস্থিত সকলের আহার-আমোদের ব্যবস্থা করিতেন। কানাইলাল মুষ্টিযুদ্ধ ও বন্দুক ছোঁড়া বিষয়ে বেশ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। মুষ্টিযুদ্ধ শিক্ষা দিতেন চন্দননগরের গোন্দলপাড়া নিবাসী প্রসিদ্ধ বিপ্লবী স্বর্গগত উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের চতুর্থ ভ্রাতা শ্রীনরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং লাঠিখেলা শিক্ষা দিতেন মুসলমান মার্ত্তাজা সাহেব ও অরুণ বাগ্দী নামক তাঁহারই জনৈক শিষ্য।

দেশচর্য্যা কর্ম্মের মধ্যে তখন অর্থাৎ ১৯০৫ সালে আরম্ভ হয় স্বদেশী প্রচার। স্বদেশী প্রচারের জন্য মানকুণ্ডুর রাসে এবং অগ্রহায়ণ মাসে চন্দননগর গোস্বামীঘাটের মেলায় স্বদেশী কাপড়াদির দোকান খোলা হইয়াছিল। চন্দননগর

বাজারে কাপড়ের ক্রেতারা যাহাতে বিলাতি কাপড় না কিনিয়া স্বদেশী কাপড় ক্রয় করেন তাহার জন্য পিকেটিং অর্থাৎ স্বেচ্ছা-প্রহরীর কাজ করা হইয়াছিল। এই সকল কাজে কানাইলালের খুব উৎসাহ পরিলক্ষিত হইয়াছিল। কোনরূপ লজ্জাবোধ না করিয়া মস্তকে স্কন্ধে বহিয়া দ্রব্যাদি লইয়া যাওয়ার কার্য্য তাঁহার মত স্বেচ্ছাসেবকদিগকেই করিতে হইয়াছিল।

দেশবাসী যাহাতে বিলাতী দ্রব্য ব্যবহার ত্যাগ করিয়া স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারের সকলবিধ অসুবিধা সহ্য করিয়া উহারই ব্যবহারে মনোনিবেশ করেন তজ্জন্য বাঙ্গালার সর্ব্বত্র সভা সমিতি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। চন্দননগরেও একাধিক স্থানে এইরূপ সভা সমিতি হইয়াছিল। বহুবাজারে ৺অমৃতলাল বসুর সভাপতিত্বে, বারাসাতে ৺মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতার সভাপতিত্বে, হাজিনগরে গোপাল বাবুর বাগানে ৺সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে কয়েকটি মহতী সভার অনুষ্ঠান হয়। গোপালবাবুর বাগানের সভার জন্য কানাইলাল প্রভৃতি অনেকে চন্দননগর ষ্টেসন হইতে সুরেন্দ্রনাথের গাড়ি টানিয়া এবং "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেরে ভাই" এই গানটি গাহিতে গাহিতে সুরেন্দ্রনাথকে সভায় লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। ধুতি-চাদর-পরা সুরেন্দ্রনাথের মুখ হইতে যখন সেই সভায় "আমি বামুনের ছেলে, আমার সমক্ষে আপনারা

শপথ করুন যে গরুর হাড় দ্বারা পরিস্কৃত বিলাতি লবণ আর আপনারা ব্যবহার করিবেন না” এই কথাগুলি বহির্গত হইয়াছিল তখন তাহা শুনিয়া শ্রোতারা আমোদ উপভোগ না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। বিলাতি খানা খাদক সুরেন্দ্রনাথ তখন কোনরূপ দ্বিধাবোধ না করিয়াই তাঁহার হিন্দুত্বের সুযোগ গ্রহণ করিতে ইতস্তত করেন নাই।

স্বদেশী প্রচার উপলক্ষে হাটখোলায় ৺শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তীর সভাপতিত্বে একটী সভার আয়োজন হইয়াছিল। চন্দননগরে সাধারণ সভার আয়োজন করিতে হইলে, সভার অধিবেশন হইবার অন্ততঃ ২৪ ঘণ্টা পূর্বে দুইজন উদ্যোক্তাকে গভর্ণমেণ্টের নিকট সভার অধিবেশন সম্বন্ধে জানাইতে হইত; কিন্তু ফরাসী সাধারণ তন্ত্রের দেশে সাধারণ সভা আহ্বানের পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়—ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের প্ররোচনায় চন্দননগরের গভর্ণমেণ্টও তখন দেশসেবকদিগের বিরুদ্ধাচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। চন্দননগরের ফরাসী নাগরিক লেঅঁ তার্দিভেল সাহেব তখন চন্দননগরের মেয়র। তিনি সঙ্কল্প করিলেন যে, তিনি কিছুতেই এই সভা হইতে দিবেন না। মিলিটারীর সাহায্যে তিনি এই সভা হইতে দিলেন না। তার্দিভেলের এই বেআইনি কার্য্য চন্দননগরের দেশসেবকগণ নির্ব্বিবাদে সহ্য করিতে পারেন নাই। তার্দিভেলের অত্যাচারের প্রতিকারের জন্য যে ব্যবস্থা করা হইয়াছিল তাহা পরে যথাস্থানে বিবৃত ইহবে। যতদিন

না বিভক্ত বঙ্গ যুক্ত করা হইয়াছিল ততদিন প্রতিবৎসর ৩০শে আশ্বিন তারিখে বঙ্গদেশের অন্যান্য স্থানের ন্যায় চন্দননগরের দেশসেবকগণও "মিলেছি আজ মায়ের ডাকে, ঘরের হ'য়ে পরের মত ভাই ছেড়ে ভাই কদিন থাকে" এই গানটি গাহিতে গাহিতে পরস্পর পরস্পরের হাতে রাখি বাঁধিয়া রাখিবন্ধন উৎসব পালন করিতেন। "ভাই ভাই এক ঠাঁই, ভেদ নাই, ভেদ নাই। এক দেশ, এক ভগবান, এক জাতি, একমনপ্রাণ" এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া যখন একে অন্যের হাতে রাখি বাঁধিয়া পরস্পর পরস্পরকে অভিবাদন করিত, তখন বাস্তবিকই সে দৃশ্য দেবতাদিগেরও দর্শনযোগ্য ও উপভোগ্য বলিয়া অনুভূত হইত।

বঙ্গভঙ্গ রহিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে '৩০শে আশ্বিন' পালনের প্রয়োজনীয়তা চলিয়া গেলেও, মনে হয়, ইংরাজ শাসনের ভেদনীতির প্রতিবাদকল্পে যে উৎসব আরম্ভ হইয়াছিল উপলক্ষ-হীনভাবে দেখিয়া স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে প্রতিবৎসর তাহা পালিত হওয়ার বিশেষ প্রয়োজন আছে। দেশে এখন বহুবিধ রাষ্ট্রীয় সংহতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উহাদের কার্য্যকলাপ দেখিয়া জনসাধারণের মনে এই ধারণাই বলবতী হইয়া উঠে যে, উহারা যেন পরস্পরবিরোধী সঙ্ঘ, কিন্তু উহারা যে একই দেশের সন্তান দ্বারা গঠিত এবং উহাদের লক্ষ্য ও আদর্শ যে একই দেশের সেবা করা, তাহা অন্ততঃ বৎসরে একবার করিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে স্মরণ করার একান্ত প্রয়োজন যে আছে সে কথা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না।

যে দেশপ্রেমবীজ বোম্বাইএ কানাইলালের অন্তরে ও মনে আশ্রয় পাইয়াছিল তাহা বাঙ্গালা তথা চন্দননগরের একটি বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের স্পর্শ পাইয়া কানাইলালকে দেশ-সেবক বিপ্লবী সন্ত্রাসধর্ম্মীর দলে প্রবিষ্ট করাইয়াছিল। এই প্রসঙ্গে কানাইলালের গুরু ৺চারুচন্দ্র রায়ের বৈঠকখানার একটি চিত্র প্রদান করিলে দেখা যাইবে, চারুবাবুর সংস্পর্শ চন্দননগরের কয়েকজন যুবককে কিভাবে অনুপ্রাণিত করিতে সহায়তা করিত। চারুবাবুর বৈঠকখানা খোসগল্পের আড্ডা ছিল না। এমনভাবে কোন একদিনও যাইত না যে দিন তাঁহার বৈঠকখানায় সমবেত যুবক বা বৃদ্ধেরা তাঁহার নিকট হইতে কোন না কোন বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ শিক্ষা না পাইয়া বাটীতে ফিরিতেন। চারুবাবু নানাবিধ দৈনিক, সাপ্তাহিক এবং মাসিক পত্র ও পত্রিকার নিয়মিত গ্রাহক ছিলেন। এতদ্‌ভিন্ন তিনি বহুবিধ তথ্যপূর্ণ পুস্তক নিজ অর্থে ক্রয় করিয়া সংগ্রহ করিতেন। আয়ারল্যাণ্ডের বৈপ্লবিক ইতিহাস সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ তিনি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ডিভ্যালেরা তখন বাঙ্গালার বিপ্লবীদের নিকট অন্যতম পূজনীয় দেবতারূপে গণ্য হইতেন। বিপ্লবের ইতিহাস সম্পর্কে প্রচলিত একটি প্রবাদবাক্যসম বাক্য এখনও আমাদের কানে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইয়া থাকে। সেই বাক্যটি হইতেছে **"A grievance redressed is a weapon broken"** "শত্রুর বিরুদ্ধে বিপ্লবীদের অভিযোগ-সংখ্যা যত অধিক হয় ততই ভাল।" বিদ্যালয় হইতে ফিরিয়া

বাটীতে জলযোগের পর মাষ্টার মহাশয়ের (চারুবাবুর) বাটীতে কানাইলালের যাওয়া চাই---এই নিয়মের ব্যতিক্রম প্রায় কোন দিনই হইত না। বিপ্লবীদের মুখপত্র "যুগান্তর" চারুবাবুর বাটী হইতেই চন্দননগরে পরিবেশিত হইত এবং চারুবাবু উহার নিয়মিত লেখক ছিলেন। কানাইলাল এই যুগান্তর পত্রের নিয়মিত অন্যতম পরিবেশক ছিলেন। অন্যান্য পত্রিকার সহিত কানাইলাল সন্ধ্যা, নিউইণ্ডিয়া, স্বরাজ, কর্মযোগীন পত্র ও পত্রিকাগুলির নিয়মিত পাঠক ছিলেন।

কানাইলালের গুরু চন্দননগরের চারুচন্দ্র রায়

শুনিয়াছি কানাইলাল চন্দননগর ত্যাগ করিয়া সক্রিয়-ভাবে বৈপ্লবিক গুপ্তসমিতির কার্য্যে যোগদান করিবার মানসে-কলিকাতায় যাইবার পূর্ব্বে—চারুবাবুর বাটীতে চারুবাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"আচ্ছা, মাষ্টার মহাশয়, আপনি আমার চরিত্রে কি কি দোষ দেখিতে পাইয়াছেন? চারুবাবু উত্তর করিয়াছিলেন, "তোমার সব ভাল, কিন্তু You are a bit too shy" কানাইলাল যে কার্য্য করিয়া বাঙ্গালার তথা ভারতের পরম নিধি বলিয়া ভারতমাতার অঙ্কে স্থান পাইয়াছেন, তাহাতে তিনি shyness (লাজুকতা) ভাবের সহিত কোন সম্বন্ধই রাখিয়া যান নাই। জীবনদানযজ্ঞে তাঁহার জীবন দানের কথা তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক হইলেও বাস্তবিকই উহা অতীব বিস্ময়কর। কারারুদ্ধ চারুবাবু যখন ইংরাজ শাসকদিগের হস্ত হইতে মুক্তি পাইয়া আলিপুর জেল হইতে চন্দননগরে ফিরিয়া আসেন, তখন তাঁহার মুখ হইতে কানাই-লাল সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছিলাম তাহার মধ্যে একটি কথা আজও ভুলিতে পারি নাই। জেলখানায় চারুবাবু কানাই-

লালকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন —ওয়ার্ডারের সহায়তায়— "তুমি গোসাঁইএর উপর এতগুলি গুলি চালালে কেন?" কানাইলাল উত্তর করিয়াছিলেন—"I wanted to be sure about the result. I was simply disgusted with attempts, attempts, attempts." চারুবাবুর নিকট হইতে শুনিয়াছি যে, গোসাঁইকে বধ করিবার পর কানাইলালের মুখে উত্তেজনাহীন প্রফুল্লতা দেখিয়া তাঁহার ওয়ার্ডার (ইউরোপিয়ান) তাঁহাকে বলিয়াছিলেন— "আচ্ছা, ফাঁসির দিন কিরূপ ব্যবহার কর দেখা যাইবে।" এই ওয়ার্ডারই পরে কানাইলালের executioner (ফাঁসি কার্য্য নিষ্পাদক) হইয়াছিলেন। ফাঁসি-মঞ্চে দাঁড়াইয়া তিনি তাঁহার executionerকে (জল্লাদকে) জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"How do you find me now?" কানাইলালের executioner হইয়াছিলেন একজন আয়ার্লণ্ড-বাসী। কানাইলালের ফাঁসীকার্য্য সম্পাদন করিয়া তিনি কারারুদ্ধ চারুচন্দ্র রায়ের নিকট বলিয়াছিলেন, "এই পাষণ্ডই কানাইলালের ফাঁসীকার্য্য সম্পাদন করিয়াছে। কানাইলালের ন্যায় একশত জোগাড় হইলেই আপনাদের কার্য্যসিদ্ধি সুনিশ্চিত।"

বহুগুণবিশিষ্ট চারুচন্দ্র রায় চন্দননগরের শিক্ষিত সমাজের গৌরব ছিলেন। স্বদেশী যুগে ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের নিকট তিনি একজন ঘোর স্বদেশী বলিয়া আখ্যাত হইতেন। চন্দননগরে যাঁহারা সততা ও বিশুদ্ধ জ্ঞানের আদর করিতেন

চারুচন্দ্র রায়

তাঁহারা সকলেই তাঁহার গুণমুগ্ধ ছিলেন। সুবিধাবাদীদের সহিত আপোষ করিয়া চলাটা যেন তাঁহার প্রকৃতির বিরুদ্ধ ছিল। দেশকর্ম্মীদের মধ্যে ছেলেমানুষী দেখিলে তিনি তাঁহাদের প্রতি কঠোর ভাষা প্রয়োগ করিতেন। পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, আয়ারল্যাণ্ডের বিপ্লবের ও বিপ্লবীদের আত্মোৎসর্গের ইতিহাস চারুবাবুর পুস্তক সংগ্রহ মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিল এবং এই ইতিহাস অবলম্বন করিয়া তিনি বাঙ্গালার বিপ্লবীদের মুখপত্র তখনকার "যুগান্তরের" জন্য বহু সন্দর্ভ লিখিয়াছিলেন।

বিশেষ করিয়া তাঁহার একটি উক্তি আমার কানে আজও ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইয়া থাকে। চন্দননগর হাটখোলায় যে, স্বদেশী সভা তদানীন্তন মেয়র তার্দিভেল সাহেব হইতে দেন নাই, সে সভার জন্য জনসভা আহ্বানের আইনানুসারে গ্রন্থকার ও স্থানীয় বাগবাজার নিবাসী ৺বিশ্বনাথ সরকার মহাশয় অ্যাড্‌মিনিসট্রেটরের নিকট ঘোষণাপত্র দাখিল করিয়াছিলেন। গভর্ণমেণ্ট এই সভা অনুষ্ঠানের ঘোর বিরোধী ছিলেন। গুজব রটে যে গভর্ণমেণ্ট ঘোষণাপত্র-দাখিলকারীদিগকে ঘোষণাপত্র প্রত্যাহার করিবার জন্য অনুরোধ করিবেন। এই গুজব শুনিয়া চারুবাবু গ্রন্থকারকে বলিয়াছিলেন "**I shall break your head if you withdraw.**" চারুবাবুর এই উক্তিতে গ্রন্থকার নিজের মনোভাবের সমর্থন পাইয়াছিলেন এবং তাঁহার বক্ষ আনন্দে স্ফীত হইয়াছিল।

চারুবাবুর শিক্ষকতা ভুলিবার নয়। চন্দননগরের ছাত্রদের মধ্যে যাঁহারা চারুবাবুর শিক্ষকতা গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা চারুবাবুর ছাত্র বলিয়া গর্ব্ব অনুভব করিয়া থাকেন। তিনি কখনও ছাত্রদের মারিয়া শাসন করিয়াছেন বলিয়া শুনি নাই, অথচ তিনি বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিলে বাহির হইতে বিদ্যালয় বন্ধ আছে বলিয়াই মনে হইত। তাঁহাকে হাসিতে খুব কম লোকই দেখিয়া থাকিবেন। কিন্তু রসিকতা যে কখনও তিনি করিতেন না তাহা নহে। গ্রন্থকার যখন ডুপ্লেক্স কলেজে পড়িতেন তখন চারুবাবু তাঁহাদের "লজিক" পড়াইতেন। সিলজিস্‌মের প্রশ্নগুলির উত্তর গ্রন্থকার সর্ব্বদা নির্ভুলভাবে করিতেন। একদিন একটি প্রশ্নের উত্তরে ঠিকমত হয় নাই। চারুবাবু তাহাতে বলিয়া উঠিলেন—"কি বাবা, বিদ্যের কি জোয়ার ভাটা খেলে নাকি?" পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে তিনি তাঁহার বন্ধু ও ছাত্রদের লইয়া শিকারে যাইতেন এবং শিকার-লব্ধ পাখীপক্ষী লইয়া ফিরিয়া নিজ বাটীতে তাঁহার সহধর্ম্মিনী দ্বারা ভোজ্য প্রস্তুত করাইয়া সমবেত সকলের সেবা করাইতেন। গ্রন্থকার মাংস খাইতেন না। উপহাসচ্ছলে তিনি তাঁহার ছাত্র-গ্রন্থকারকে বলিয়াছিলেন। "আচ্ছা, তুমি একদিন খাও, তারপর ইচ্ছা হয় ছাড়িয়া দিও।" কপটতা তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। তাঁহার বাহ্য আচরণ দেখিয়া তাঁহাকে কঠোর বলিয়া মনে হইলেও তিনি ভিতরে খুব কোমল-হৃদয় ছিলেন। তিনি কলেজে ইংরাজি সাহিত্য

এবং লজিক পড়াইতেন। কিন্তু গ্রন্থকারদের সময়ে ৺কালী-কুমার গাঙ্গুলি মহাশয়কে লজিক পড়াইবার ভার দেওয়া হইয়াছিল। কালীবাবু খুব খাটিয়া ও অত্যন্ত যত্ন করিয়া পড়াইলেও, ছাত্রেরা বুঝিতে পারিতেছিল যে, তাঁহার পড়ানোর ফল তাহাদের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারিতেছে না। চারুবাবু গ্রন্থকারকে একটু অধিক ভালবাসেন এই মনে করিয়া ছাত্রেরা তাহাকে তাহাদের নেতা করিয়া চারুবাবুর নিকট যাইল এবং চারুবাবুকে গ্রন্থকারের মুখ দিয়া বলিল "মাষ্টার মহাশয়, আমাদের লজিক পড়ান ভাল হইতেছে না।" চারুবাবু বলিলেন—"তা আমাকে কি করতে হবে?" ছাত্রেরা বলিল—"আপনাকে পড়াতে হবে।" চারুবাবু রহস্য করিয়া বলিলেন "কে মাইনে দেবে?" ছাত্রেরা বলিল—"ওসবতো আমরা জানি না, আপনাকে পড়াতে হবে।" চারুবাবু বলিলেন "কেন, কালী-বাবুর পড়ান কি ভাল হচ্ছে না?" ছাত্রেরা বলিল—"কালী-বাবু খুব খেটে পড়াচ্ছেন কিন্তু আমাদের কিছুই হচ্ছে না।" ছাত্রদের পক্ষে অবাধ্যতা চারুবাবু একটা অমার্জ্জনীয় অপরাধ বলিয়া গণ্য করিতেন, কিন্তু তাহা হইলেও তিনি এক্ষেত্রে কালীবাবুর সহিত আলোচনার পর ছাত্রদের প্রার্থনা পূরণ করিতে সম্মত হইয়াছিলেন।

১৯৩০ সালে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনকারী কয়েকজন বিপ্লবী চন্দননগর-গোন্দলপাড়ার উত্তরাঞ্চলে অবস্থিত একটি বাটী ভাড়া করিয়া তাহাতে অবস্থান করিতেছিলেন। গভীর

এক রাত্রে কলিকাতার পুলিশ কমিশনার মিষ্টার টেগার্ট সাহেবের নেতৃত্বে একদল ব্রিটিশ পুলিশ সেই বাড়ীতে হানা দেয়। বিপ্লবীরা তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিয়া পলাইতে চেষ্টা করেন, কিন্তু সংঘর্ষের ফলে যুবক মাখনলাল ঘোষালকে প্রাণত্যাগ করিতে হয় এবং অবশিষ্ট সকলে ধৃত হন।

চন্দননগরবাসী মাখনলালের মৃতদেহ দাহ করিবার জন্য বোড়াইচণ্ডীতলা-শ্মশানঘাটে শোভাযাত্রা করিয়া মৃতদেহ লইয়া যাইতে কৃতসঙ্কল্প হইলে, ফরাসী কর্তৃপক্ষ শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনার আশঙ্কায় বা তাহার অজুহাতে উহাতে বাধাদান করিতে অগ্রসর হন। তখন চন্দননগরের মেয়র ছিলেন দেশবরেণ্য চারুচন্দ্র রায়। ফরাসী আইনানুযায়ী মেয়রও দেশের শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য দায়ী। চারুবাবু গভর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি এড্‌মিনিস্ট্রেটরকে বলিলেন "শান্তিরক্ষার ভার আমাকে দিন, আমি শান্তিতে সকল কার্য্য সমাধা করাইয়া দিব।" এড্‌-মিনিস্ট্রেটর চারুবাবুর প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং চারুবাবু শোভাযাত্রার পুরোভাগে থাকিয়া উহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া শ্মশানঘাট পর্য্যন্ত শান্তির সহিত পহুঁছাইয়া দিলেন।

১৯৩০ সালে চন্দননগর কলেজ পুনঃস্থাপনের জন্য নূতনভাবে আন্দোলন চলিতেছিল। তখন চারুচন্দ্র রায় চন্দননগরের মেয়র এবং তিনি চন্দননগরের পক্ষ হইতে ফরাসী ভারতের প্রতিনিধি সভার অন্যতম সভ্যও ছিলেন। পূর্ব্বে নানাপ্রকার চেষ্টা সত্ত্বেও চন্দননগর কলেজ পুনঃস্থাপিত

হইতে পারে নাই। চারুবাবু পুনরায় চেষ্টা করিয়া গভর্ণমেণ্টকে কলেজস্থাপনে সম্মত করাইয়াছিলেন। আলোচনার পর স্থির হইয়াছিল যে, চন্দননগর-মিউনিসিপ্যালিটি কলেজ পরিচালনের খরচ বাবদে বাৎসরিক চারি হাজার টাকা দিলেই গভর্ণমেণ্ট কলেজ পুনঃস্থাপনে উদ্যোগী হইয়া তাহার ব্যবস্থা করিবেন। কলেজ পুনঃস্থাপিত হইলে চারুবাবুর মর্য্যাদা বাড়িয়া যাইবে মনে হওয়ায় কয়েকজন স্বার্থান্ধ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির কার্য্য কলেজ পুনঃস্থাপনের বিরোধী হইয়া উঠিয়াছিল।

সেই সময় চন্দননগরের নির্ব্বাচকদের তুই তালিকার সাহেবদের তালিকা এবং দেশীয়দের তালিকা-একীকরণ করিবার জন্য আন্দোলন চলিতেছিল। সক্রিয় কোন আন্দোলন না করিলে গভর্ণমেণ্ট কিছুতেই প্রজাদের দাবীতে কর্ণপাত করিবেন না এইরূপ বুঝিয়া সকল রাজনীতিক দল একমত হইয়া জনসভায় এই প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন যে, বিভিন্ন কাউন্সিলের সকল বাঙ্গালী সভ্য সভ্যপদ ত্যাগ করিবেন এবং মিউনিসিপ্যালিটির কার্য্য চালাইবার জন্য যদি কমিশন নিযুক্ত হয় তাহা হইলে তাহারও সভ্যপদ চন্দননগরের কোন বাঙ্গালী অধিবাসীই গ্রহণ করিবেন না। চারুবাবু বড়ই বিপদ গণিলেন। একদিকে জনসভায় গৃহীত প্রস্তাবের সম্মান রক্ষা, অন্যদিকে কলেজ পুনঃস্থাপনের সুযোগ গ্রহণ। কি করা যায়? চারুবাবু দেখিলেন, কলেজ পুনঃপ্রতিষ্ঠার এই সুযোগ ছাড়া খুব নির্ব্বুদ্ধিতার কার্য্য হইবে। তিনি জনসভায় গৃহীত প্রস্তাবের বিরোধিতা না করিয়া সভ্যপদে

ইস্তফা দিলেন। কিন্তু যতদিন না তাঁহার সভ্যপদত্যাগ গভর্ণর কর্ত্তৃক গৃহীত হয় এবং তাঁহার (অর্থাৎ মেয়রের) কার্য্যভার তাঁহার স্থলাভিষিক্তকে দেওয়া হয়, ততদিন পর্য্যন্ত আইনসঙ্গতভাবে তিনি স্বীয় পদে অধিষ্ঠিত রহিলেন এবং এই অবসরের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিয়া কাউন্‌সিল আহ্বান করিলেন এবং মিউনিসিপ্যালিটি হইতে গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রার্থিত অর্থ বরাদ্দ করিয়া দিলেন। চারুবাবুর এই সৎসাহস ও বিচক্ষণতা তাঁহার চরিত্রোচিতই হইয়াছিল, কিন্তু ইহার জন্য তাঁহাকে একাধিক স্থান হইতে নানারূপ বিরুদ্ধ সমালোচনা সহ্য করিতে হইয়াছিল। কিন্তু চারুবাবু তাঁহার প্রতিজ্ঞায় অটল রহিলেন এবং মাত্র একজন সাহেব সভ্য মঁসিয়ে লেহুরোর সহযোগিতায় (তখন মঁসিয়ে লেহুরো মিউনিসিপ্যাল সভায় সাহেব-তালিকা কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত অন্যতম সভ্য ছিলেন) গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রার্থিত টাকা কাউন্‌সিল হইতে বরাদ্দ করিয়া দিলেন এবং এই কার্য্য দ্বারা তিনি কলেজ পুনঃস্থাপনের পথ পরিষ্কার করিয়া দিলেন। চন্দননগর কলেজ যদি চন্দননগরের অন্যতম উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান হয়, তাহাহইলে উহার জন্য চারুবাবুর যাহা প্রাপ্য তাহা চারুবাবুকে দিতে হইবে। সাধারণের কাজে জনতার নিকট হইতে হাততালি পাওয়াটাই কোন কালে চারুবাবুর লক্ষ্য ছিল না। কিন্তু নিন্দা, স্তুতি অগ্রাহ্য করিয়া প্রায় সকল সময়েই মাত্র দেশের মঙ্গলের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই তাঁহাকে তাঁহার কর্ত্তব্যপালন করিতে দেখা গিয়াছিল

চারুবাবুর জীবনের আরও কয়েকটি কথার উল্লেখ করিলে, আশা করি, পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিবে না। সত্য ব্যবহার তাঁহার কাছে সত্যই প্রিয় ছিল বলিয়া "সত্যং ব্রুয়াৎ প্রিয়ং ব্রুয়াৎ; ন ব্রুয়াৎ সত্যম্ অপ্রিয়ং" সংস্কৃত ভাষায় প্রচলিত এই প্রবচনটি তাঁহার স্মৃতিতে আসিলে তিনি তাঁহার মস্তিষ্কে যেন একটা জ্বালা অনুভব করিতেন। তিনি বলিতেন—সত্য সর্বদা এবং সর্ব্বথাই সেব্য ও পালনীয় এবং যাহা অসত্য তাহা সর্ব্বথা এবং সর্ব্বদাই পরিত্যজ্য। সত্য অপ্রিয় হইলেও তাহা বলিবার মত সংসাহস সকলেরই থাকা উচিত।

১৯১৮ সালে চন্দননগর পুস্তকাগারের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্য নির্বাচনের ফলে চারুবাবু অন্যান্যের সহিত সভ্য নির্বাচিত হন। বিপ্লবী নামে খ্যাত চারুবাবু নির্ব্বাচিত হওয়ায় কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতিতে একটা সোরগোল পড়িয়া যায়। চারুবাবু চন্দননগরের একজন প্রসিদ্ধ "এনার্কিষ্ট"। তাঁহার সহিত একসঙ্গে বসিয়া অন্যান্য সভ্যেরা কিরূপে মাথা বাঁচাইয়া চলিতে পারিবেন! সভ্যদের এইরূপ মনোভাব দেখিয়া চারুবাবু নিজেকে একঘরে করিয়া সমিতির সভ্যপদ ত্যাগ করেন। পদ-লোলুপতা চারুবাবুকে কোন কার্য্যে আকর্ষণ করিতে পারিত না, ইহা তাহারই একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কিন্তু পুস্তকাগারের তদা-নিন্তন কার্য্যকরী সমিতির সভ্যদিগের এইরূপ মনোভাব ও আচরণ নিশ্চয়ই নিন্দনীয় ও বিরুদ্ধ সমালোচনার যোগ্য। যে ফরাসী গভর্ণমেণ্ট বিপ্লবনেতা ৺অরবিন্দ ঘোষকে নিজরাজ্য

পণ্ডিচারীতে প্রকাশ্যে আশ্রয়দান করিতে ইতঃস্তত করেন নাই, সেই গভর্ণমেণ্টের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া চন্দননগরের একদল লোকের এইরূপ আচরণ কোন দেশপ্রেমিকই সমথন করিতে পারিবেন না।

স্বদেশী যুগের বহু পূর্ব্বে যখন চন্দননগর পুস্তকাগারের সহিত চারুবাবুর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল এবং যখন তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম পরিচালক ছিলেন, তখন পুস্তকাগার-বাটীতে কয়েকজন উৎসাহী শিক্ষিত যুবক চারুবাবুকে লইয়া মধ্যে মধ্যে একটি সাহিত্যালোচনাসভার অনুষ্ঠান করিতেন। এই সভায় বহু বিষয়ের আলোচনা হইত। কিছুদিন এইভাবে চলিবার পর চারুবাবু একটি সভায় এই মন্তব্য প্রকাশ করেন—মাত্র আলোচনার দ্বারা বিশেষ কোন ফলোদয়ের আশা নাই। সভায় আলোচনার ফলে যাহা অবশ্যকরণীয় বলিয়া স্থিরীকৃত হইবে যদি প্রত্যেক, সভ্য তাহা অবশ্যপালনীয় বলিয়া তাঁহাদের স্ব স্ব জীবনে পালন করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ না হন, তাহা হইলে তাঁহাদের এইরূপ আলোচনা নিরর্থক। তাঁহার সহিত অন্যান্য সভ্যেরা একমত না হওয়ায় তিনি সভার সহিত সকল সম্পর্ক ত্যাগ করেন। পক্ষপাতিত্বদোষ তিনি ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। এই দোষটি ব্যাপকভাবে দেশে বর্ত্তমান দেখিয়া তিনি প্রায়ই অতিমাত্রায় বিচলিত হইতেন এবং যেখানে উহা দেখিতেন সেখানকার সহিত তিনি সকল

সম্পর্ক ত্যাগ করিতেন।

চারুবাবুর চতুঃষষ্টিতম জন্মোৎসব উপলক্ষে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালির অধ্যাপক বিদ্বান ও জ্ঞানবান ডক্টর বেনীমাধব বড়ুয়ার মুখ হইতে যে সন্দর্ভ গ্রন্থকার লিখিয়া আনিয়াছিলেন তাহা হইতে একটি প্রধান অংশ উদ্ধৃত করিয়া আমি এই পরিচ্ছেদের উপসংহার করিতেছি—"His retirement from the Dupleix College was no doubt a serious loss to the institution, while to me, it was a great gain, because both of us being daily passengers to Calcutta and coming by the same train, I could avail myself of many an opportunity of talking together, heart to heart, our conversation embracing all subjects of human interest and cultural importance. He never allowed to feel any discomfort because of our difference in age. One thing always struck me, namely, the alertness and receptivity of his intellect. It often appeared, as if there was no subject of importance in which he did not feel interest, on which he had no information and which he was not eager to know. The childlike

simplicity and inquisitiveness was very frequently manifest in his looks and beaming face. There was no occasion in which he had not regretted that he could not begin again his life from the very beginning. The great point in his conversation was the soundness of his opinion, the accuracy of his observation, his grasp of the principles and the methodical approach of the issues involved. He would always impress me, as a lover of ancient art and architecture, as a great admirer of modern scientific method of investigation and application, a sincere worshipper of everything —literature, religion, history which went to build up our civilization. He was adamant and unyielding on certain points and maintained, therefore, strong views of his own. If it was a question between a scientifically trained medical practitioner and an apothecary, he would rather die at the hands of the former than live a hundred years more by the charms of the latter. A man of his talent and out-

look and high intellectual capacity and moral stamina is rare indeed in the whole of Bengal. He is a man with courage of conviction, with the boldness of calling a spade a spade and stick to his honest opinion, no matter how others take it to be."

"ডুপ্লেক্স কলেজ হইতে চারুবাবুর অবসরগ্রহণ কলেজের পক্ষে যে অত্যধিক ক্ষতির কারণ হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহে নাই, কিন্তু উহাতে আমি নিজে খুব লাভবান হইয়াছিলাম। আমরা উভয়েই এক ট্রেনে কলিকাতায় যাইতাম ও একই ট্রেনে ফিরিতাম এবং এই সময়ে আমি তাঁহার সহিত মানুষের সকল প্রকার কর্মের ধারা ও কৃষ্টি সম্বন্ধে ঘনিষ্ঠভাবে আলাপ করিবার সুযোগ পাইতাম। বয়সের তারতম্যের জন্য আমাকে কখনও কোনরূপ অস্বস্তি বোধ করিতে হয় নাই। তাঁহার অতন্দ্র, সজাগ বুদ্ধিবৃত্তি দেখিয়া আমি বিস্মিত হইতাম। আমার প্রায়ই মনে হইত যে, এমন কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নাই, যাহা জানিতে তিনি আগ্রহান্বিত নন বা যাহার সম্বন্ধে তিনি কিছু না কিছু জানেন। তাঁহার হাবভাবে ও উজ্জ্বল মুখমণ্ডলে শিশুর সারল্য ও ঔৎসুক্য প্রায় সকল সময়েই বিদ্যমান থাকিত। একেবারে গোড়া হইতে পুনরায় জীবন আরম্ভ করিতে পারা যাইবে না বলিয়া

তিনি সকল সময়েই আক্ষেপ করিতেন। তাঁহার সহিত কোন বিষয়ের আলোচনাকালে তাঁহার মতের বিচক্ষণতা, বস্তুর অভ্রান্ত যথার্থ রূপদর্শনক্ষমতা, বিচারের মূল সূত্রগুলি এবং বিচার্য্য বিষয়ের পরিবেশের প্রতি সুসংবদ্ধ দৃষ্টি, এই সকল বিষয় বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিবার থাকিত। প্রাচীন শিল্প ও স্থপতি বিদ্যা এবং অনুসন্ধান ও গবেষণার উপযোগী বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক পন্থা সকলের প্রতি আন্তরিক অনুরাগ এবং যে সাহিত্য, ধর্মবিশ্বাস ও ইতিহাস আমাদের সভ্যতাকে গড়িয়া তুলিয়াছে সেই সকলের প্রতি যে তিনি গভীর শ্রদ্ধাসম্পন্ন, তাহা আমি বেশ বুঝিতে পারিতাম। কোন কোন সময়ে তিনি তাঁহার মত এত দৃঢ়তার সহিত ব্যক্ত করিতেন যে, তাহা হইতে তাঁহাকে কিছুতেই বিচ্যুত করিতে পারা যাইত না। একজন হেতুড়ে চিকিৎসকের তন্ত্র মন্ত্র দ্বারা আরোগ্যলাভ করিয়া শতবর্ষ বাঁচিয়া থাকা অপেক্ষা একজন বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষাপ্রাপ্ত চিকিৎসকের চিকিৎসায় বরং মৃত্যুবরণ তিনি বাঞ্ছনীয় মনে করিতেন। তাঁহার ন্যায় মেধা বিদ্যাবুদ্ধি ও নীতিবোধসম্পন্ন ব্যক্তি বাস্তবিকই সারাবঙ্গে অতীব বিরল। তাঁহার চরিত্রে আত্মবিশ্বাসজনিত সৎসাহস ছিল। সত্য ব্যবহার ছিল তাঁহার চরিত্রের বিশেষত্ব। অন্যের মতামত যাহাই হউক না কেন, তিনি তাঁহার অন্তর দিয়া যে মতটি গ্রহণ করিতেন, তাহা হইতে কোন অবস্থায়ই বিচ্যুত

হইতেন না।"

চারুবাবু সম্বন্ধে আলোচনা উপলক্ষে তাঁহার কোন কোন সহকর্ম্মী তাঁহার একটি কার্য্য সম্বন্ধে সম্মানহানিকর উক্তি করিয়া তাঁহার চরিত্র খাটো করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। এইরূপ উক্তি হয়ত বিদ্বেষসঞ্জাত নহে; কিন্তু তাঁহাদের উক্তি হইতে মাত্র ইহাই বুঝিতে হইবে যে, চরিত্রে এবং আদর্শে তাঁহাদের সহিত চারুবাবু সমপর্য্যায়ভুক্ত ছিলেন না। কার্য্যটি হইতেছে-অরবিন্দ বাবু যখন চন্দননগরে গুপ্তভাবে অবস্থান করিতে আসিয়াছিলেন, তখন প্রথমে তিনি চারুবাবুর বাটীতে উঠিতে চাহিয়াছিলেন। চারুবাবু অরবিন্দ বাবুকে তাঁহার বাটীতে উঠিতে দিতে সম্মত হইতে পারেন নাই। কাহারও কাহারও নিকট এটি চারুবাবুর একটী অমার্জনীয় অপরাধ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু অরবিন্দ বাবু যতদিন চন্দননগরে ছিলেন তাহার মধ্যে বেশী দিনই তিনি ভাড়াটে বাড়ীতেই বাস করিয়াছিলেন। তিনি চারিদিন ছিলেন বোড়াইচণ্ডীতলানিবাসী ৺মতিলাল রায় মহাশয়ের বাটীতে, একদিন ছিলেন তিনি খেজুরতলানিবাসী ৺সন্তোষচন্দ্র দে মহাশয়ের বাটীতে, কিছুদিন ছিলেন তিনি নিচুপটীতে, কিছুদিন ছিলেন তিনি গোন্দলপাড়ায় এবং অবশিষ্ট কয়দিন তিনি ছিলেন বাগবাজারস্থিত 'করের বাগানে'। তারপর চন্দননগরে অবস্থান না করিয়া তিনি পণ্ডিচারীতে গমন করেন এবং তথায় মৃত্যুদিবস পর্য্যন্ত

অবস্থান করেন। মোট কথা তখন অরবিন্দ বাবুর চন্দননগরে অবস্থান করা ব্যাপারটিই সকলের পক্ষে নিরাপদ বলিয়া গণ্য হয় নাই। তাহার পর অরবিন্দ বাবু বিপ্লবতন্ত্র পরিত্যাগ করিয়া বেদান্ত পথাশ্রয়ী হন এবং সেই পথেরই যাত্রী অবস্থায় ইহলীলা সংবরণ করেন।

কানাইলালের জীবনের দু'একটি কথা

কানাইলালের মাতুলালয়ের নিকটে উত্তর দিকে কালীতলায় গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের পশ্চিম পার্শ্বে অবস্থিত একটি বস্তিতে—এখন যেখানে একটি শিশুবিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে—কয়েকখানি চালাঘর ছিল। এক রাত্রে এই বস্তিতে আগুন লাগে। আগুন লাগিলে যেরূপ সোর-গোলের সৃষ্টি হইয়া থাকে তাহার কোন অভাবই তথায় দৃষ্ট হয় নাই। যিনি যেখানে যাহা পাইলেন—বালতি, বর্ত্তনাদি লইয়া নিকটস্থ পুষ্করিণী হইতে জল আনিয়া অগ্নি-নির্ব্বাপনকার্য্যে লাগিয়া গেলেন। কানাইলালও পূর্ণ উৎসাহে সেই কার্য্যে যোগ দিয়া তাঁহার কর্ম্মপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিলেন। যাঁহাদিগকে চালার মটকার উপর উঠিয়া চালায় জল ঢালিতে দেখা গিয়াছিল, কানাইলাল তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। কানাইলাল সেদিন জ্বরে ভুগিতে ছিলেন।

মাতুলালয়ে অবস্থানকালে গ্র্যাণ্ট ট্রাঙ্ক রোডের পূর্ব্বে অবস্থিত বহির্বাটীর দ্বিতলে কানাইলাল শয়ন করিতেন। এই দ্বিতল বাটীর উপরতলাটি এখন নাই। এক রাত্রে চন্দননগরের পূর্ব্ব প্রান্তে প্রবাহিত ভাগিরথী নদীর পূর্ব্বদিকে অবস্থিত চটকলের কয়েকজন সাহেব কর্ম্মচারী চন্দননগরে আসিয়া মদ্যপান করিয়া কানাইলালের

মাতুলালয়ের অনতিদূরে বিষম হল্লা করিতেছিল। শয়ন-কক্ষ হইতে কানাইলাল এই হল্লা শুনিয়া নিচে নামিয়া আসিয়া তাহাদিগকে হল্লা করিতে নিষেধ করিলেন, কিন্তু যখন তাহারা কানাইলালের কথা শুনিল না, তখন মাতাল সাহেবগুলিকে মুষ্ট্যাঘাত দ্বারা দুরস্ত করিয়া তথা হইতে কানাইলাল তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিলেন। সাহেবগুলিকে ঠ্যাঙাইতে কানাইলাল খুব আমোদ উপভোগ করিয়াছিলেন। এই মারের পর এই পাড়ায় এইরূপ অবস্থা দাঁড়ায়াছিল যে তথায় আর কেহ কোনদিন হল্লা করিতে সাহসী হইত না।

প্রবেশিকা পরীক্ষা দেওয়ার পর কানাইলাল কয়েক মাসের জন্য কলিকাতায় ফেয়ারলী প্লেসে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের এজেণ্ট আফিসে চাকুরী করিয়াছিলেন। চাকুরী করিতে যাইয়া একটী বিষয়ে তাঁহার যে অভিজ্ঞতা হইয়াছিল, তাহা তিনি বর্ণনা করিতে খুব আমোদ পাইতেন। কাজ করিতে করিতে যাহাদের ঢুলুনি আসিত, তাহাদিগকে ডিপার্টমেণ্টের কর্ত্তারা খাতার উপর কলম ধরিয়া ঢুলিতে অভ্যাস করিতে বলিতেন। কানাইলাল এই চাকুরিকে তাঁহার জীবনের উপযোগী কর্ম বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন নাই।

১৯০৭ খৃষ্টাব্দে যখন বিদেশী-বর্জ্জন আন্দোলন পূর্ণমাত্রায় চলিতেছিল, তখন 'ওয়ারেন্স সার্কাস' নামক একটি বিলাতী সার্কাস কোম্পানী চন্দননগরে সার্কাস দেখাইতে

আসিয়াছিল। শ্রদ্ধেয় চারুচন্দ্র রায়ের বাটীতে কানাইলাল প্রভৃতি কয়েকজন মিলিয়া পরামর্শ আঁটিলেন। এই সার্কাস কোম্পানীকে 'বয়কট' করিতে হইবে। 'বয়কট দি ফিরিংগীজ' লেখা 'পোষ্টার' প্রস্তুত করা হইল এবং পোস্টারগুলি সহরের নানাস্থানে রাত্রের মধ্যেই আঁটিয়া দেওয়া হইল। দল বাঁধিয়া খেলাস্থলে 'পিকেটিং' চালান হইল। পিকেটার-দিগের সহিত সার্কাস কর্ত্তাদের ভীষণ সংঘর্ষ হইল। যেখানে যাহা পাওয়া গেল তাহাই লইয়া পিকেটারগণ মারপিট আরম্ভ করিয়া দিলেন। চন্দননগরের প্রসিদ্ধ বিপ্লবী ৺উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও পিকেটারদলভুক্ত ছিলেন। তিনি ঘটনাস্থলে প্রাপ্ত একখানি বড় তক্তা লইয়া অনেককে আঘাত করিয়া জখম করিয়া দিয়াছিলেন।

কানাইলালের দ্বিতীয় ভগ্নীর নিকট হইতে প্রাপ্ত কানাইলাল সম্বন্ধে দুই একটি কথা

৺মতিলাল রায় তাঁহার দ্বারা লিখিত "কানাইলাল" পুস্তকে লিখিয়াছেন–কানাই প্রতিদিন আড়াই সের করিয়া মহিষের দুগ্ধ পান করিতেন। কানাইলালের ভগ্নীকে এবং কানাইলালের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীআশুতোষ দত্ত মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়া এই কথাটির সমর্থন পাওয়া যায় নাই। তা ছাড়া, আড়াই সের মহিষ দুগ্ধ পান করিয়া হজম করার গঠিত শরীর কানাইলালের ছিল না। তবে ইহা সত্য যে মহিষ দুগ্ধ কানাইলালের প্রিয় খাদ্য ছিল। ভাত, রুটি ব্যতীত মুড়ি, কলা, নারিকেলও তাঁহার প্রিয় খাদ্য ছিল। চাপটুলি খাইয়া বসিয়া আহার করা অপেক্ষা উপুড় হইয়া বসিয়া খাইতে কানাই যেন আরাম পাইত। প্রায়ই দেখা যাইত খাইবার সময় বিড় বিড় করিয়া কি যেন বলিতেছে, দেখা যাইত ভাতের থালায় আঙ্গুল দিয়া কি লিখিতেছে। কোন দিন বা দেখা যাইত দুধ না খাইয়াই উঠিয়া পড়িয়াছে।

বি. এ. পরীক্ষা দিবার পর একদিন অপরাহ্নে তিনটার পর, মা'র নিকট হইতে খাইবার জন্য কানাই একটু দুধ চাহিল। তখন দুধ ছিল না। মা তাহাকে মুড়ি, কলা, নারিকেল খাইতে দিলেন। কানাই মা'কে বলিল,—মা, কিছু দিনের জন্য আমি কলকাতায় যাবো। মা জিজ্ঞাসা

করিলেন, 'কতদিন থাক্‌বি?' কানাই উত্তর করিল—'মাস খানেক'। কানাইলাল বা তাঁহার মাতা জানিতেন না যে কানাইলালের এই যাওয়াই মাতার নিকট হইতে তাঁহার শেষ বিদায় গ্রহণ।

কানাইলালের রিভলবারপ্রাপ্তিযোগ

কানাইলাল যে কার্য্য করিয়া বাঙ্গালীর শ্রদ্ধা ও পূজা পাইতেছেন এবং ভারতবাসীমাত্রেরই নিকট হইতে শ্রদ্ধা ও পূজা পাইবার অধিকারী হইয়াছেন, সেই কার্য্যটি বিপ্লব-পন্থীদের গুপ্ত সমিতির দ্বারা নির্দ্ধারিত একটি কার্য্য-বিশেষ। এই কথাটি মনে রাখিয়া বিষয়টির বিবরণ দিতে প্রবৃত্ত না হইলে কার্য্যটির প্রকৃত রূপ ফুটিয়া উঠিবে না। ব্রিটিশ ভারতে অস্ত্র আইন প্রতিষ্ঠিত থাকায় খোলাখুলি-ভাবে আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহ করা ছিল অসম্ভব—অতএব অস্ত্র যোগাড় করিতে হইলে তাহা গুপ্তভাবেই যোগাড় করিতে হইত। কানাইলালের কার্য্যের জন্য সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন হইয়াছিল—গোপনে রিভলবার যোগাড় করা এবং উহা যোগাড় করার পর গুপ্তভাবে উহাকে আলিপুর জেলে প্রবিষ্ট করাইয়া তথায় আবদ্ধ বিপ্লবীদের হস্তগত করাইয়া দেওয়া এবং এই কার্য্যটি করার পর সংগৃহীত অস্ত্রদ্বারা অস্ত্রসংগ্রহের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা। বিপ্লবীদের কার্য্যের জন্য চন্দননগর হইতে আগ্নেয়াস্ত্র সংগৃহীত হইয়াছিল এবং সংগৃহীত অস্ত্রগুলির মধ্যে দুইটি রিভলবার গোসাঁইবধ দিবসের দুই তিন দিন পূর্ব্বে আলিপুর জেলে প্রবিষ্ট করান হইয়াছিল। এ কথা সত্য যে একেলা কেহই কানাই-লাল ও সত্যেন্দ্রনাথকে রিভলবার যোগাইবার সৌভাগ্যে
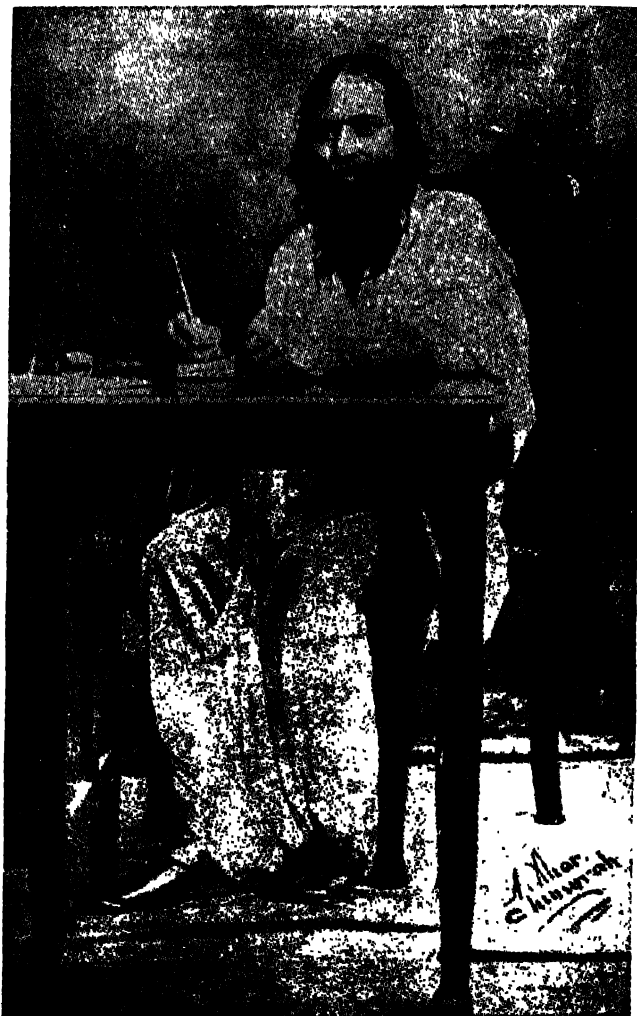
মতিলাল রায়

সৌভাগ্যবান হইতে পারেন নাই। এই কার্য্যটিকে সৌভাগ্যবানের একটি কার্য্য বলিয়া অভিহিত করিলাম এইজন্য যে, এখন চন্দননগরের একাধিক নাগরিক এই কার্য্যের অসঙ্গত কর্ত্তৃত্বের দাবী করিয়া আত্মবিজ্ঞাপনের পথে অগ্রসর হইয়াছেন। এইরূপ প্রচেষ্টা হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, যাঁহারা গুপ্ত সমিতির কার্য্যে লাগিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ মিথ্যা যশের মোহ ত্যাগ করিতে না পারিয়া মিথ্যাবাদিতার আশ্রয় লইয়াছেন। যে দুইটি রিভলবার গোসাঁইবধদিবসের দুই-তিন দিন পূর্ব্বে আলিপুর জেলে প্রবিষ্ট করান হইয়াছিল তাহা পরলোকগত মতিলাল রায় কলিকাতায় তাঁহার কর্মস্থানে অর্থাৎ জর্জ হেণ্ডারসন কোম্পানীর আফিসে লইয়া গিয়া তথায় রাখিয়াছিলেন। চন্দননগরের গোন্দলপাড়ানিবাসী শ্রীবসন্ত-কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সেই রিভলবার দুইটি মতিবাবুর কর্ম্মস্থান হইতে লইয়া গিয়া কলিকাতায় নিজবাসায় রাখিয়াছিলেন। তারপর একটি রিভলবার তিনি নিজে আলিপুর জেলে ৺উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের হস্তে এবং অন্যটি চন্দন-নগরের ফটকগোড়ানিবাসী ৺শ্রীশচন্দ্র ঘোষ লইয়া যাইয়া কানাইলালের হস্তে দিয়া আসিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ এই দুইটি রিভলবারই গোসাঁইবধকার্য্যে ব্যবহৃত হইয়াছিল। গুপ্ত-সমিতির কর্ম্মীরা যেরূপ সফলতার সহিত গোসাঁইবধ কার্য্যটি নিপুনভাবে সম্পাদন করিয়াছিলেন তাহার জন্য এই কার্য্যের

সহিত সম্পর্কিত সকল কর্ম্মীই দেশবাসীর শ্রদ্ধার পাত্র। ইংরাজ শাসক বা অন্য কেহ কখনও স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন নাই যে, বাঙ্গালী এতটা সাহসী হইয়া এরূপ কৌশলে এই কার্য্যটি কৃতকার্য্যতার সহিত সম্পাদন করিতে পারিবেন। সে যাহা হউক, কানাইলালকে এই কার্য্যটি সম্পাদন করিবার জন্য যে আত্মত্যাগ করিতে হইয়াছিল তাহা অতুলনীয়। আত্ম-ত্যাগের এমন উজ্জ্বল, অপূর্ব্ব, বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত সকল দেশেই অতীব বিরল! তবে এই প্রসঙ্গে শহীদ ক্ষুদিরাম বসু ও দীনেশচন্দ্র রায় ওরফে প্রফুল্লকুমার চাকীর নাম সমভাবে স্মরণীয়। ইঁহারা যেভাবে আত্মত্যাগ করিয়া বিশ্বদরবারে বাঙ্গালীর মুখোজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে বিশ্বইতিহাসে চিরদিনই বাঙ্গালীর নাম কীর্ত্তিত হইতে থাকিবে।

বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতের স্বাধীনতা

ইংরাজ রচিত ও প্রবর্তিত আইন কানুন মানিয়া এবং ইংরাজের সহিত মিত্রতা বজায় রাখিয়া দেশসেবা করাটা যে প্রকৃত দেশসেবা নহে এই বোধ যখন কতিপয় শিক্ষিত দেশবাসীর মনে বদ্ধমূল হইল, তখন দেশে একদল হিংসাত্মক বিপ্লবপন্থীদের লইয়া গুপ্তসমিতিসকল গড়িয়া উঠিল এবং তাঁহাদের দেশসেবার মূলমন্ত্র হইল আত্মাহুতি দিয়া অর্থাৎ প্রকৃত মরিয়া হইয়া দেশের কাজে লাগিয়া যাওয়া। বিপ্লববাদীদের প্রেরণার প্রকৃত রূপ দিয়াছেন পরবর্ত্তীকালে কবি নজরুল ইসলাম। তিনি গাইয়াছেন—

"ভয় দেখিয়ে ক'চ্চ শাসন,
জয় দেখিয়ে নয়,
ভয়ের মাথায় মারবো লাঠি,
করবো তারে জয়।"

দেশশত্রু ও দেশদ্রোহীর মনে ভীতি সঞ্চার করাই হইল বিপ্লবধর্ম্মীদের মূলনীতি বা প্রধানতম কার্য্য। কিন্তু ইহার ফলে ইংরাজ এদেশ হইতে চলিয়া যাইবে অথবা দেশবাসীর নিছক কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ইংরাজ দেশশাসকগণ শাসনসংস্কারে প্রবৃত্ত হইবেন কিনা—মনে হয়—বিপ্লবীদের এই বিষয়ে কোন সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না। ভারতে ইংরাজ রাজত্ব যে ক্রমশঃ দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইয়া আসিয়াছিল

তাহা কেবল ইংরাজের বীরত্বের ফলে নহে। ইহা সম্ভব হইতে পারিয়াছিল ইংরাজের রাজনীতির কৌশলকুশলতায়, এবং সেইসঙ্গে ভারতবাসীর ঐক্যানুভূতির এবং তদুপযোগী ব্যবহারের ও কার্য্যের অভাবের জন্য। ইংরাজের নিকট হইতে সুশাসন প্রার্থনাই ছিল ভারতের রাজনীতিকদের কর্মবেদ। পরে ১৯০৬ সালে কলিকাতায় পূর্ব্বোল্লিখিত জাতীয় কংগ্রেসের দ্বাবিংশতিতম অধিবেশনে উহার সভাপতি দাদাভাই নৌরজী ইংরাজ রাজনীতিক স্যর হেনরী ক্যাম্পবেল ব্যানারম্যানের উক্তি "সুশাসন কখনই স্বায়ত্বশাসনের স্থান গ্রহণ করিবার উপযুক্ত হইতে পারে না" তাঁহার ভাষণের প্রারম্ভে যখন উচ্চৈস্বরে ঘোষণা করিলেন তখন রাজনীতিক ভারতবাসী যেন একটি নূতন আলোকের সন্ধান পাইলেন। ইংরাজ ভারতের ছাত্রদিগকে কলেজে বার্কের 'Reffexions on the Revolution in France' এবং "Speech on American Taxation" প্রভৃতি বিশ্ববিখ্যাত পুস্তক সকল পড়িতে দিতে আপত্তি করেন নাই; কিন্তু যখন সভায় সভায় "বন্দেমাতরম্" ধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল এবং দেশের সর্বত্র স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার ও বিদেশী দ্রব্য বর্জন প্রতিজ্ঞা গৃহীত হইতে লাগিল তখনই তাহারা ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল এবং মাথা ঠিক রাখিতে পারিল না। কিন্তু ইংরাজের রক্তচক্ষু ভারতবাসীকে, বিশেষতঃ বাঙ্গালীকে, ভীত দমিত না করিয়া তাহাকে দারুণ সাহসী করিয়া তুলিল। কোন্ স্বর্গের আশায় বাঙ্গালী বীরগণ যে নিজেদের

এবং দেশের শাসকবর্গের জীবন লইয়া ছিনিমিনি খেলিতে লাগিয়া গেলেন তাহা তাঁহারা জানিতেন না; কিন্তু যাঁহারা সেই সময়ের বিশিষ্ট আলো-বাতাসে চলাফেরা করিতেছিলেন তাঁহারা ইহাকে কোন দেবযজ্ঞের প্রজ্জ্বলিত অগ্নি বলিয়াই গ্রহণ করিয়া লইয়াছিলেন। পূর্বে দেশ বিদেশের ইতিহাসের বিশেষ বিশেষ অধ্যায়ে এইরূপ অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া গিয়াছে ও এখনও হইয়া চলিয়াছে এবং এই অগ্নি প্রজ্জ্বলিত রাখিবার জন্য যে সমিধ ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে তাহা প্রধানতঃ যাজ্ঞিকদিগের আত্মাহুতিতেই পুষ্ট। বৈজ্ঞানিক অবৈজ্ঞানিক সকলেই এখন মানিয়া চলিতেছেন যে জগতে কোন ঘটনাই বিনা প্রয়োজনে ঘটে না। ইহাই যদি সত্য হয়, তাহা হইলে বলিতেই হইবে যে ভারতের বর্ত্তমান রাজনীতিক স্বাধীনতা আনয়নে বাঙ্গালী অবাঙ্গালী রাজদ্রোহী তথা বিপ্লবীগণ বড় অল্প অংশ গ্রহণ করেন নাই। সত্যরাজ্যে রাজদ্রোহিতা পাপ ও দুর্নীতিপুষ্ট রাজ্যে ইহাই পুণ্য। এখন রাজনীতিক স্বাধীনতা সকল দেশেরই কাম্য হইয়া উঠিয়াছে; কিন্তু বিগত মহাযুদ্ধে যাহা দেখা গেল তাহা হইতে শিক্ষা করিবার অনেক কিছু আছে। মাত্র রাজনীতিক স্বাধীনতাই কোন দেশ বা জাতিকে স্বাধীন চিন্তক্ষম মস্তিষ্ক প্রদান করিতে পারে না। বিগত মহাযুদ্ধগুলির পূর্বে স্বাধীন জার্মান ও স্বাধীন জাপান খুবই শক্তিশালী জাতি বলিয়া পরিগণিত ছিল, কিন্তু আজ তাহাদের অবস্থা কিরূপ? সকল স্বাধীন

জাতিকেও বুঝিতে হইবে—স্বাধীনতা উচ্ছৃঙ্খলতা নহে। ঘরে বাহিরে সর্ব্বথা এবং সর্ব্বদা সর্ব্ববিধ উচ্ছৃঙ্খলতা ত্যাগই স্বাধীনতাভোগমন্দিরের প্রথম মধ্য ও শেষ সোপান। এই সত্যকে মনে প্রাণে এবং কার্য্যে বরণ ও পালন করিতে হইবে। "আত্মাই আত্মার বন্ধু এবং আত্মাই আত্মার শত্রু" মনুষ্যসমাজেও ইহা অপেক্ষা বড় সত্য আর নাই। যে জাতি এই সত্য স্বীকার না করিয়া তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিবে তাহার ধ্বংশ অনিবার্য্য। দুনিয়ার মনুষ্য সমাজের ভাঙ্গা-গড়ার ইতিহাস এই সত্যেরই একরূপ আত্মবিকাশ। ভগবানের নিকট প্রার্থনা যেন আমরা এইরূপ সজাগ বুদ্ধির আশ্রয় লইয়া আমাদের জাতীয় জীবন অতিবাহন করিয়া যাইতে পারি।

শ্রীশচন্দ্র ঘোষ

কানাইলালের আত্মার উদ্দেশ্যে

উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কসম বঙ্গের গগনে,
নূতন বীরত্বে তব উজলিয়া দিশি,
করিলে বিস্মিত যবে ভারতীয় জনে,
আঁধার হইল দূর, প্রভাতিল নিশি।

ভারতের ইতিহাসে খ্যাত বহু বীর,
তাদের কীর্ত্তিতে তারা হয়েছে অমর;
ক্লীবতা জিনিয়া, পুনঃ, কানাই সুবীর,
নবশক্তি বহাইলে দেশে, শক্তিধর।

রাষ্ট্রবুদ্ধি, দেশে তার বড়ই অভাব,
মন্ত্রগুপ্তি কারে বলে জানে বা তা কেহ,
অল্পাঘাতে দেখা দেয় কদর্য্য স্বভাব,
পরহস্তে সঁপে দেয় আপনার গেহ।

শিক্ষা তব হয়েছিল মারাঠার দেশে,
বঙ্গেতে আসিয়া তুমি পুনঃ দীক্ষা নিলে;
বিশ্বাসঘাতকে বধি, নাশিয়া নিঃশেষে.
কীর্ত্তিধ্বজা সগৌরবে সুউচ্চে স্থাপিলে।

লিখন পঠনে তুমি অল্প নাহি ছিলে,
গুরুজন তব তাহা এক বাক্যে কয় ;
পঠনেরে কর্ম্মদ্বারা সার্থক করিলে,
কর্ম্মের প্রবাহ যেন এদেশেতে বয়।

তুমি চলে গেছ রেখে আদর্শ তোমার
স্বদেশ-যজ্ঞেতে পূত আত্মাহুতি দিয়া ;
মোরা যেন উপযুক্ত হই হে তাহার,
প্রয়োজনে অবহেলে আত্ম-বিসর্জ্জিয়া।

যেথা থাক, দেব ! তোমা ভুলিবেনা দেশ,
মুক্ত আজি সত্য তাহা, ঘুচে যেন ক্লেশ।

কানাইএর অবদান

কানাইলালের বীরত্বগাথা গাহিতে যাইয়া তাঁহার পূর্ব্বগত আদর্শ কর্ম্মীদ্বয় প্রফুল্লকুমার চাকি এবং ক্ষুদিরাম বসুর নামোচ্চারণ না করিলে লেখনীর মর্য্যাদা রক্ষিত হইবে না। সত্য বটে, বিশ্বনিয়ন্তার কর্ত্তৃত্বের বাহিরে কোন কার্য্যই সংঘটিত হয় না, কিন্তু কেন যে তিনি দুইটি নিরপরাধ ইংরাজের জীবনান্ত ঘটাইয়া দুইজন বরেণ্য দেশ-সন্তানের ইহলীলা সাঙ্গ করাইলেন, কে তাহার তত্ত্ব নিরূপণ করিবে? রাজার পাপে যদি রাজ্য নষ্ট হইতে পারে, তাহা হইলে বলা যায় ইংরাজরাজ্যের পাপে দুইজন নিরপরাধ ইংরাজকে প্রাণ দিতে হইয়াছে, আর আমাদের পাপে আমরা দেশের বহু সুসন্তানকে অকালে হারাইয়াছি।

এখন জাতি গড়িয়া উঠিয়াছে বলিলে নিশ্চয়ই সত্য বলা হইবে না, কিন্তু জাতি যে গঠনের পথে চলিয়াছে, ইহা বিশ্বাস না করিলে দেশবাসী কোন্ মন্ত্রে সঞ্জীবিত থাকিবে? দীর্ঘকাল পরাধীন মৃতপ্রায় থাকিয়া জাতি এখন স্বাধীন হইয়া নিজের ভাগ্যের নিয়ন্তা হইয়াছে; সুতরাং এখন জাতির প্রতি কেহ বিশ্বাসঘাতকতা করিলে, কোন ব্যক্তিবিশেষকে বা কোন খণ্ড—প্রতিষ্ঠানকে তাহার প্রতিকারের উপায় সন্ধান করিতে হইবে না—এখন রাষ্ট্রই জাতির প্রতি বিশ্বাস-

ঘাতকতার দণ্ডবিধান করিবে। তবে কি আমাদের দেশে এখন আর কানাইলালের মত বীর যুবকের কোন প্রয়োজন নাই? অবশ্যই আছে। কানাইলালের কার্য্য জাতির জীবনসৌধের ভিত্তিতে মাত্র একখণ্ড প্রস্তর স্থাপন ভিন্ন আর কিছুই নহে। কানাইএর মত বীর সন্তানদের ত্যাগেব উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া যে জাতীয় সৌধ নির্ম্মাণ করিতে হইবে, তাহার বিশালতার শেষ নাই বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। আজ ভারতের কর্ণধার পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু 'work, work, work' এই বাণীটি তাঁহার ভাষণের পর ভাষণে দিতেছেন। এই বাণীটি দাদাভাই নওরোজীর 'agitate, agitate, agitate' বাণীরই ক্রমবিকাশ। এ কাজের বিরাম নাই। কাজ করিয়া জাতিকে সর্ববিষয়ে শক্তিশালী হইতে হইবে এবং প্রয়োজন হইলে রক্তদান করিয়াও জাতির উপর সকলবিধ আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে হইবে। এই কার্য্য দু'একজন বিশ্বাসঘাতককে দুনিয়া হইতে সরান অপেক্ষা যে সহস্র এমন্ কি লক্ষ গুণ কঠিন তাহা স্বীকার করিতে কেহই দ্বিধাবোধ করিবেন না। কানাইলাল প্রভৃতি বীর সন্তানদিগের ত্যাগে যে যজ্ঞাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে তাহাতে সমস্ত জাতিকে সমিধ যোগাইতে হইবে। কানাইলাল আবদ্ধ অবস্থায় ছলে বলে কৌশলে অস্ত্রের সহায়তায় একজন দেশশত্রুর নিপাতসাধন করিয়াছেন। এখন যিনি বা যাঁহারা জাতির কর্ণধার বা কর্ণধারের সহায়ক হইবেন,

তাঁহাদিগকে নানাবিধ অস্ত্রের উদ্‌ভাবন করিতে হইবে- শরীর ও মনের যথোপযুক্ত নিয়োগ দ্বারা নানা প্রকার শক্তির উন্মেষ .ঘটাইতে হইবে। প্রয়োজন হইলে ছল বা ডিপ্লোম্যাসীর চরম যাহা তাহারও সন্ধানে সচেষ্ট থাকিতে হইবে এবং যোগীর ন্যায় ধ্যানপরায়ণ হইয়া নানা সুকৌশলের সহায়তায় সমস্ত বিপদের সম্মুখীন হইয়া তাহা হইতে উদ্ধার পাইতে হইবে। আন্তর্জ্জাতিক জীবনে মিলনের পথগুলি আবিষ্কার করিয়া ও পূর্ণোদ্যমে জাতীয় আদর্শের নির্ম্মলতা রক্ষা করিয়া সর্ব্বজাতির গ্রহণীয় একটি আদর্শ উদ্‌ভাবন করিতে হইবে এবং এই পার্থিব জগতে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া মানবতার উচ্চতম শৃঙ্গে আরোহণ করিতে হইবে। এখন এই কাজই সর্বজাতির সাধনার লক্ষ্য হওয়া একান্ত প্রয়োজন। ইহার পর কোথায় যাইতে হইবে তাহার সদুত্তর মহাকালই দিতে পারিবে!

সাধারণ কানাই

কানাইলাল সম্পূর্ণ কৃতকার্য্যতার সহিত জেলের ভিতর নরেন্দ্রনাথ গোসাঁইএর জীবনান্ত ঘটাইতে সক্ষম হইয়াছেন—অতএব কানাইলালকে এই ঘটনার পূর্ব্ববর্ত্তী কালেও একজন অসাধারণ বালক বা যুবক হইতে হইবে, এইরূপ একটি দাবীদ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া অনেকে কানাই-লাল সম্বন্ধে অনেক আজগুবি তথ্য সাধারণ্যে পরিবেশিত করিয়াছেন।

কানাইলাল কতকগুলি অসাধারণ গুণের অধিকারী হইলেও, তাঁহাকে অনেক সময় অকিঞ্চিতকর কার্য্যেও নিযুক্ত থাকিতে দেখা গিয়াছে। দাবাবোড়ে খেলায় অত্যধিক ঝোঁক উাহার মধ্যে একটি। পাড়ায় একটি থিয়েটারের দল ছিল। কানাইলাল সেই দলের আকড়ায় গিয়া বসিয়া কখন কখন বেহালায় ছড়ি টানিতেন। তাঁহাকে 'নলদময়ন্তীর' পালায় সারথির ভূমিকা অভিনয় করিতে দেওয়া হইয়াছিল। কোনও কথোপকথনে সারথির যোগ দিবার ছিল না। পিতাকে তামাক সাজিয়া দিতে যাইয়া একদিন কানাই কল্‌কেতে ঠিক্‌রে না দিয়া তামাক সাজিয়া আনিয়াছিলেন—তাহাতে পিতা তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া বলিয়াছিলেন, '**You cannot do this simple work, I wonder how you will pass your examination.**'

আর একটি মজার কথা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। তিনি জীবনের বেশী ভাগ সময় বোম্বাইএ কাটাইয়াছিলেন বলিয়া বাঙ্গালা ভাল জানিতেন না। বোম্বাই হইতে আসিয়া কিছুদিন স্কুলে পড়ার পর তাঁহাকে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় পাশ করিতে হইয়াছিল। ঔৎসুক্য হইল—বাঙ্গালা হইতে ইংরাজী অনুবাদ—পেপারটি তিনি কিরূপ লিখিয়াছেন তাহা জানিতে। কিরূপ অনুবাদ করিয়া আসিয়াছেন তাহা কানাইলাল ছত্রের পর ছত্র বলিয়া যাইলেন। এক জায়গায় ছিল "একটি নগরে।" কানাই তাহার অনুবাদ করিলেন " In the town of Ekati." অন্যত্র ছিল 'বিজন বনে'—কানাইলাল তাহার অনুবাদ করিলেন—'In the forest of Bijan.' যাঁহারা কানাইএর এই অনুবাদ দুইটি শুনিলেন তাঁহারা না হাসিয়া থাকিতে পারিলেন না।

কানাইলাল কর্ত্তৃক নিহত নরেন্দ্রনাথ গোস্বামী ও তাহার আত্মকথা

দুষ্কৃতজনের বিনাশসাধন কোন অবস্থায়ই পাপ নহে, ইহা না বলিলেও চলে। নরেন্দ্রনাথ গোসাঁই তাহার কৃত-কর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে, তাহাতে কাহারও কিছু বলিবার নাই। আমাদের দুঃখ এই যে, গোসাঁইএর জন্য আমাদিগের দেশের দুইজন সুসন্তানকে অর্থাৎ যাহাকে বলে দুইজন "হীরার টুকরা" যুবককে ফাঁসী কাষ্ঠে ঝুলিয়া বিপ্লবদেবতার ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতে হইয়াছে।

নরেন্দ্রনাথ গোসাঁই বঙ্গদেশের হুগলী জেলার অন্তর্গত শ্রীরামপুর সহরের একটি ধনী জমিদার বংশসম্ভূত সন্তান। গোসাঁই সম্বন্ধে পূজনীয় অরবিন্দ ঘোষ তাঁহার কারা-কাহিনীতে লিখিয়াছেন—"গোসাঁই অতিশয় সুপুরুষ, লম্বা, ফরসা, বলিষ্ঠ, পুষ্টকায়; কিন্তু তাঁহার চোখের ভাব কুপ্রবৃত্তি-প্রকাশক ছিল, কথায় বুদ্ধিমত্তার কোন লক্ষণ পাই নাই। ......গোসাঁইএর কথা নির্ব্বোধ লঘুচেতা লোকের কথার ন্যায় হইলেও তেজ ও সাহসপূর্ণ ছিল। তাঁহার তখন সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল যে তিনি খালাস পাইবেন।......এইরূপ লোকই approver হয়।......অন্য সকলের ন্যায় তাঁহার শান্ত ও শিষ্ট

স্বভাব ছিল না। তিনি সাহসী, লঘুচেতা এবং চরিত্রে, কথায়, কর্ম্মে অসংযত ছিলেন। ধৃত হইবার সময় নরেন গোসাঁই তাঁহার স্বাভাবিক সাহস ও প্রগলভতা দেখাইয়াছিলেন, কিন্তু লঘুচেতা বলিয়া কারাবাসের সামান্য কষ্ট ও অসুবিধা সহ্য করা তাঁহার পক্ষে অসহ্য হইয়াছিল।” শ্রদ্ধেয় দেশবরেণ্য অরবিন্দ ঘোষের এই উক্তিটি ঠিক যেন একজন সুদক্ষ গণৎকারের উক্তি। এইরূপ গণনায় যাঁহাদের বিশ্বাস আছে তাঁহারা ইহাতে যুগপৎ বিস্মিত ও চমৎকৃত হইবেন।

বাঙ্গালার বিপ্লবযজ্ঞের অন্যতম প্রসিদ্ধ হোতা চন্দননগরের গোন্দলপাড়ানিবাসী শ্রীবসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট হইতে জানা গিয়াছে যে গোসাঁই খুব ভাল ছেলেই ছিল। অরবিন্দ বাবুও গোসাঁইকে তেজস্বী ও সাহসী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এখন জিজ্ঞাস্য—শ্রদ্ধেয় অরবিন্দ বাবুর প্রদর্শিত হেতুসকল গণনার মধ্যে না ধরিয়াও, মনস্তত্ত্বের দিক হইতে গোসাঁইএর রাজসাক্ষী হওয়ার কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যায় কিনা।

গোসাঁই যে গুপ্তসমিতির একজন ভাল কর্ম্মী ছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। চন্দননগরের মেয়র তার্দি-ভেল সাহেবকে বধ করিবার জন্য গোসাঁইই গুপ্তসমিতি কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছিল এবং গোসাঁইই মারণাস্ত্রটি অর্থাৎ বোমাটি কলিকাতা হইতে চন্দননগরে আনিয়াছিল। গোসাঁই-

এর পথপ্রদর্শকরূপে চন্দননগর-হাটখোলানিবাসী গুপ্তসমিতির সভ্য শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঘোষ তাহার সঙ্গে ছিলেন। শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন যে, গোসাঁইই তার্দিভেলকে লক্ষ্য করিয়া বোমাটি নিক্ষেপ করিয়াছিল। চন্দননগরের বড়বাজারে তার্দিভেল সাহেব "রু কার্ণো" গলিতে অবস্থিত যে দ্বিতল বাটীতে বাস করিতেন, সেই বাটীর উপর তলার দক্ষিণ অংশের ছাদযুক্ত খোলা বারান্দায় তার্দিভেল সাহেব যখন রাত্রিকালীন ভোজনে বসিয়াছিলেন, সেই সময় তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বোমাটি নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। বোমাটি ঠিকমত প্রস্তুত হয় নাই বলিয়া উহা বিদীর্ণ হয় নাই। সে যাহা হউক, তার্দিভেলের বধপ্রচেষ্টাব্যাপারে গোসাঁইই প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল। এরূপ চরিত্রের লোক কেন যে রাজসাক্ষী হইল সে তত্ত্ব ঠিক শ্রদ্ধেয় অরবিন্দ বাবুর দর্শন দিয়া সম্পূর্ণ বোঝা যায় না। গোসাঁইকে ধরা হয় হুগলী জেলার অন্তর্গত শ্রীরামপুরস্থিত তাঁহাদের বাটী হইতে এবং তাহার নাম পাওয়া যায় বিপ্লবযজ্ঞের প্রধানতম পুরোহিত স্বর্গীয় বারীন্দ্রকুমার ঘোষের দ্বারা প্রদত্ত বিবৃতি বা স্বীকারোক্তি হইতে। ৺বারীন্দ্রকুমার ঘোষ পরে তাঁহার বিবৃতি প্রত্যাহার করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার বিবৃতি যে তাঁহার দলের অনিষ্ট সাধন করিয়াছিল তাহা স্বীকার করিতে হইবে। পুলিশ যে তাঁহার এবং অন্যতম প্রধান বিপ্লবী ৺উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিবৃতি লইয়া স্বীয় কৃতিত্ব প্রদর্শনে ব্যাপৃত

হইয়াছিল তাহা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। পুলিশ যে সকল কৌশল অবলম্বন করিয়া আসামীদের নিকট হইতে স্বীকারোক্তি সংগ্রহ করিয়া থাকে তাহার একটির নমুনা এখানে দেওয়া হইলে উহা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। গ্রন্থকার যখন মেদিনীপুর সেণ্ট্রাল জেলে "অন্তরীণ" আইনে আবদ্ধ ছিলেন, সে সময় উক্ত জেলে কুমিল্লার একজন বিপ্লবী শ্রীমনীন্দ্রনাথ সেন ধৃত হইয়া আসেন। তাঁহার সহিত আলাপ আলোচনার মধ্যে পুলিশ তাঁহাকে বোকা বনাইয়া তাঁহার নিকট হইতে কিরূপে স্বীকারোক্তি সংগ্রহ করিয়াছিল তাহা তিনি বিবৃত করেন। এই যুবকটি খুব শক্ত কর্ম্মী ছিলেন, তবুও তিনি পুলিশের কৌশলে কিরূপে পথভ্রষ্ট হন তাহার বিবরণ দেন। পুলিস একদিন তাঁহার নিকটে আসিয়া তাঁহার কর্ম্মের সম্পূর্ণ ঠিকুজি উপস্থাপিত করিয়া তাঁহাকে বলেন, "আপনি কোন্ কথা লুকাইবেন, আমরা আপনার সম্বন্ধে সকল কথাই জানি। আপনি যেখানে যেখানে যাইয়া যাহা যাহা করিয়াছেন তাহার বিবরণ আপনাকে পড়িয়া শুনাইতেছি, ইহা হইতে আপনি বুঝিতে পারিবেন যে আপনার সম্বন্ধে সকল কথাই আমরা জানি, তবে আর লুকাইয়া কি করিবেন?" মনীন্দ্রবাবু দেখিলেন যে, পুলিশের বিবরণ সর্বাংশেই সত্য। এইরূপ অবস্থায় অপরিপক্কবুদ্ধি যুবক যাহা করিয়া থাকে মনীন্দ্রবাবু তাহাই করিলেন—সমস্ত স্বীকার করিয়া ফেলিলেন।

অনুমান করা যাইতে পারে যে, নরেন্দ্রনাথ গোসাঁইকে রাজসাক্ষী করিবার উদ্দেশ্যে পুলিশ এইরূপ কোন কৌশল অবলম্বন করিয়াছিল। ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে পুলিশ গোসাঁইকে বলিয়াছিল, "দেখুন, আপনার নাম অমুকেরা করিয়াছেন, আর তাঁহারা মাত্র আপনার নাম করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, তাঁহারা আরও অনেকের কার্য্যের বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন। তাঁহারা যাহা করিয়াছেন তাহা করিতে আপনার প্রতিবন্ধকতা কোথায়?" কিসে গোসাঁই পথভ্রষ্ট হইয়াছিল তাহা নিশ্চিত করিয়া বলিবার মত প্রমাণ নাই বটে, কিন্তু তাহা হইলেও সে এমন জঘন্যভাবে কেন নিজ-দলের শত্রুতাসাধন করিতে অগ্রসর হইল তাহা কতকটা অনুমান করিতে পারা যায়। তবে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইবার মত কারণ বর্ত্তমান থাকিলেই যে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতে হইবে এমন কোন কথা নাই। গোসাঁই নিহত হইলে 'ষ্টেট্‌সম্যান' লিখিয়াছিলেন "We hope that no attempt will be made to minimise this brutal and callous murder on the ground that the victim was an approver. The informer is apt to be regarded with contempt as a traitor to his cause and his motives may often justify the odium in which he is held. But of Narendranath Gossain it may at least be said that he was implicated by the con-

fession of those who now proffer to look upon him as a traitor and he did little more than pay them back in their own coin".

স্টেট্‌সম্যানের এই উক্তির মধ্যে কানাইলালের বীরত্বের মর্য্যাদার কিছুটা লাঘব ঘটাইবার প্রচেষ্টা থাকিলেও, উহাতে গোসাঁইএর রাজসাক্ষী হওয়ার প্রবৃত্তির কৈফিয়তের যে ব্যাখান আছে তাহা যে একেবারে অগ্রাহ্য করিবার বিষয় তাহা নহে। ভাবাবেগ অনেক ক্ষেত্রে বুদ্ধিকে স্থান-ভ্রষ্ট করিয়া থাকে, কিন্তু তাই বলিয়া একের বুদ্ধিহীনতার দোহাই দিয়া অন্যের বুদ্ধিহীনতাকে কোন সুনীতিই সমর্থন করিবে না। অতএব গোসাঁইএর দলদ্রোহিতা বা দেশ-দ্রোহিতা কিছুতেই মার্জনীয় হইতে পারে না।

তদুপরি, "স্টেট্‌স্‌ম্যান" যে নিরস্ত্র গোসাঁইকে অস্ত্রদ্বারা হত্যা করার কথা তুলিয়া হত্যাকারীকে কাপুরুষ আখ্যায় আখ্যাত করিয়াছিলেন, তাহার জবাব 'পাইওনিয়ার' যাহা দিয়াছিলেন তাহার উপর আর অন্য কথা চলিতে পারে না। 'পাইওনিয়ার' এই সঙ্গে "ইংলিশম্যানের" লেখারও জবাব দিয়াছিলেন। "পাইওনিয়ারে" ১৯০৮ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বরে যাহা লেখা হইয়াছিল তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ এইরূপ—

আলিপুর জেলের ভিতরে সম্পাদিত হত্যাকে কলি-কাতার কাগজগুলি উত্তেজনাবশে যে ভাষায় সমালোচনা

করিয়াছেন, ভাষার অপব্যবহারের সেরূপ দৃষ্টান্ত সহজে মিলিবে না। "ইংলিশম্যান" ইহাকে "বর্ব্বরোচিত এবং জঘন্য" আখ্যায় আখ্যাত করিয়াছেন। অতীব নিষ্ঠুর ও লজ্জাকর অবস্থায় সম্পাদিত বা অলঙ্কারের লোভে বিশিষ্ট নীচ উদ্দেশ্যে সম্পাদিত শিশুহত্যারূপ কার্য্য সম্বন্ধেই এইরূপ ভাষা প্রয়োগ করা যাইতে পারে। সকল হত্যাই নিন্দার্হ, কিন্তু আলিপুর জেলে সম্পাদিত এই হত্যা যে নীচভাবপ্রণোদিত নহে, তাহা বলিলে অন্যায় বলা হইবে না। "স্টেট্‌স্ম্যান" আরও রং চড়াইয়া ইহাকে 'কাপুরুষোচিত' বলিয়াছেন— যে হেতু অস্ত্রশস্ত্র লইয়া একজন নিরস্ত্রকে হত্যা করা হইয়াছে। "ষ্টেট্‌স্ম্যানের" এইরূপ লিখিবার উদ্দেশ্য কি ইহাই যে, দুর্ব্বৃত্ত দুইজনের উচিত ছিল গোপন কথা প্রকাশ-কারীকে তৃতীয় আগ্নেয়াস্ত্রটি দেওয়া এবং নির্দিষ্ট সঙ্কেত-দানে তাহাকে সতর্ক করিয়া গুলিছোঁড়া। কিন্তু সম্ভবতঃ বাঙ্গালার জেল ব্যবস্থাতেও এই সকল প্রাথমিক অনুষ্ঠান সম্ভবপর হইত না। যাহা হউক—হত্যাকারীরা যখন দ্বন্দ্বযুদ্ধব্রতী নহে, তখন তাহাদের বধপাত্রকে সতর্ক ও উপযুক্তভাবে অস্ত্রসজ্জিত না করিয়া হত্যা করাতে তাহা-দিগকে বিশিষ্ট নিন্দায় কলঙ্কিত করিলে উপহাসাস্পদ হইতেই হইবে। হত্যাকারীদের এই কার্য্য 'কাপুরুষোচিত' হইতেই পারে না। জেলের চতুঃপ্রাচীরের মধ্যে এই কার্য্য করিয়া পলায়নের কোন আশাই থাকে না। আত্মহত্যা

বা ফাঁসিকাষ্ঠে ঝোলা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। এই হত্যাকে দুঃসাহসিক বলা যাইতে পারে, কিন্তু ইহাকে কাপুরুষোচিত বলিলে বুদ্ধিস্থিরতার অভাবেরই পরিচয় দেওয়া হইবে! হত্যার একটি মাত্র দণ্ড থাকিলেও, উহার কালিমার বর্ণভেদ আছে এবং ঠিকমত বিচার করিয়া দেখিলে এই আলিপুর হত্যার বর্ণ একেবারে কালো নহে বলিলে উহা নিতান্ত অপবর্ণনা হইবে না। গোপনীয় সংবাদদাতা নিজেকে বাঁচাইবার জন্য তাহার সহকর্ম্মীদের সর্ব্বনাশসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। সেসন্স আদালতে তাহার যাহা বক্তব্য তাহা বলিবার জন্য উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই তাহাকে শমনসদনে প্রেরণ করিতে সঙ্কল্প করা হইয়াছিল। একদিকে তাহার জীবন—অন্যদিকে অন্য সকলের জীবন এবং হত্যাকারী দুইজন অন্য সকলের জন্য আত্মবিসর্জ্জনে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল। ইহা হত্যা, কিন্তু আত্মবিসর্জ্জনও বটে। আইন নিজপথ লইতে একটুও পরাঙ্মুখ হইবে না এবং যে গোপনীয় সংবাদদাতাকে গভর্ণমেণ্ট রক্ষা করিতে সক্ষম হয় নাই তাহার হত্যার প্রতিশোধ লইতে বিচারবিভাগ অবশ্য বাধ্য। কিন্তু মনস্তত্ত্বের দিক হইতে বিচার করিলে আমরা দণ্ডবিধির ধার ধারিব না এবং ব্যাপারটিকে অসংলগ্ন ভাষাভরণে না ঢাকিয়া ফেলিলে আমরা উহার প্রকৃত রূপ দেখিতে পাইব। আলিপুর হত্যাকে যদি আমরা হীন নির্ম্মম এবং কাপুরুষোচিত বলি, তাহা হইলে যাহারা

কামচরিতার্থতার জন্য যুবতী স্ত্রীলোকদিগকে হত্যা করিয়া থাকে কিম্বা শয্যাশায়ী বৃদ্ধা স্ত্রীলোককে যাহারা তাহার সঞ্চিত অর্থের জন্য হত্যা করিয়া থাকে তাহাদিগের সম্বন্ধে আমরা কি বলিব? ইহার পর যদি বাঙ্গালীরা এই দুইজন যুবককে হারমোডিয়াস্ এবং আরিস্টোজাইটনের স্থানে তাঁহাদের স্মৃতিবেদীতে স্থাপন করিতে চাহে, তাহা হইলে বুঝিয়া উঠা খুব সহজ হইবে না যে কিরূপে তাহাদিগের এই পক্ষাবলম্বনে কেহ ন্যায্য আপত্তি উত্থাপন করিতে পারে। "স্টেট্স্ম্যানের" যে উক্তিটির জন্য "পাইওনিয়ার' চটিয়া গিয়া উপরে লিখিত জবাব দিয়াছিলেন তাহা এই—"In any case, whatever view may be taken of his (Gossain's) character and motive, murder is murder and in this instance it was the cowardly assassination of an unarmed man by men who were provided with deadly weapons."

নরেন্দ্রনাথ রাজসাক্ষী হইবার পর তাহার পিতা দেবেন্দ্রনাথ তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন এবং সেই সাক্ষাৎকারের একটি বিবরণ ১৬–৯–১৯০৮ তারিখের "দি বেঙ্গলী" সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। দেবেন্দ্রবাবুর বিবরণের যে অংশটি বর্ত্তমান বিষয়ে প্রাসঙ্গিক তাহা এই—"I told him, though the crown has par-

পূর্ণচন্দ্র দে
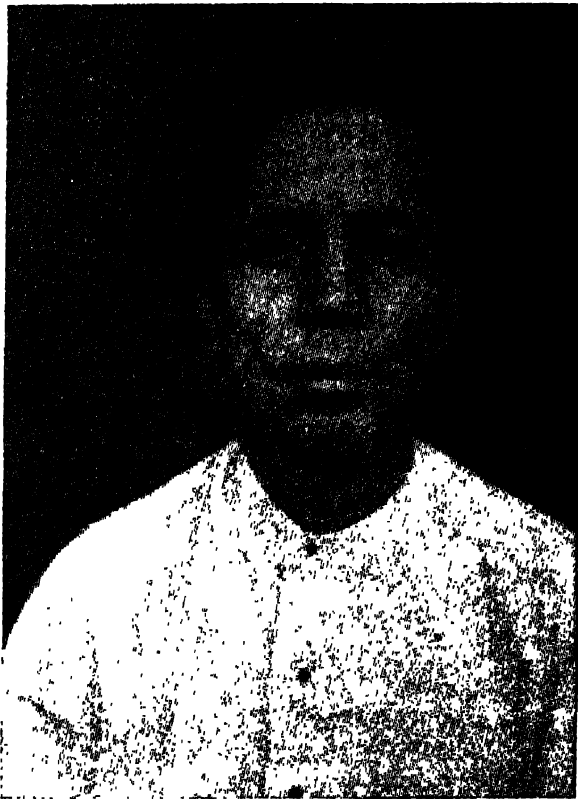
doned him; still, in my opinion, he ought to be hanged." The reporter said, "why?" I said, "This is not the proper place and time to discuss the matter."

ইহার পর দেবেন্দ্রবাবু যখন নরেন্দ্রের সহিত দেখা করিয়াছিলেন তখন নরেন্দ্র তাহার পিতাকে কি বলিয়াছিল তাহা ১৮-৯-১৯০৮ তারিখের "বন্দে মাতরম্" পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। নরেন্দ্রের উক্তির এক অংশ হইতেছে এই—Father, I have brought shame upon my family. I think it is better for me to die. I have been misguided by Barindra and others. I ask your pardon. I wish also to atone for what I have done.

"আমি আমার বংশ কলঙ্কিত করিয়াছি। আমার পক্ষে মৃত্যুই শ্রেয় বলিয়া আমি মনে করি। বারীন্দ্র এবং অন্যান্যের দৃষ্টান্তে আমি পথভ্রষ্ট হইয়াছি। আমি আপনার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি। আমি যাহা করিয়াছি তাহার জন্য প্রায়শ্চিত্তও করিতে চাই।" ইহাই অনুতপ্ত নরেন্দ্রনাথের কথা।

কানাইলাল ও তাঁহার পিতৃমাতৃকুলের কিঞ্চিৎ পরিচয়।

কানাইলালের শরীর তেমন পুষ্ট রকমের না থাকিলেও বলিষ্ঠ ও শক্তিশালী ছিল। তাঁহার ললাট ছিল প্রশস্ত রকমের। হাত দু'খানি যে বেশ লম্বা ছিল আর ঠোঁট দু'খানি যে বেশ পুরু রকমের ছিল তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। তিনি চুল ফিরাইয়া টেরি কাটিতেন। কানাইলালেরা দুই ভ্রাতা এবং সাত ভগিনী। বড় ভাই শ্রীআশুতোষ দত্ত বোম্বাই ইউনিভারসিটি হইতে পাশ করা এল্. এম্. এস্, ডাক্তার। কানাই-এর মাতুলেরা চারি ভাই ও তাঁহার মাতা তাঁহাদের একমাত্র ভগিনী। কানাই তাঁহার মাতা শ্রীমতী ব্রজেশ্বরীর দ্বিতীয় বা কনিষ্ঠ পুত্র। কানাই-এর পিতা ৺চুনিলাল দত্ত 'মেরিন্ একাউণ্টস্' অফিসে কাজ করিতেন। 'মেরিন্ একাউণ্টস্' অফিস যখন কলিকাতা হইতে বোম্বাই-এ চলিয়া যায়, কানাই-এর পিতাও বোম্বাই-এ চলিয়া যান। কানাই-এর বয়স তখন তিন বৎসর। কানাই-এর দাদামহাশয় স্বর্গীয় হরকুমার দত্ত ইন্দোরের ব্রিটিশ রেসিডেন্সীর ট্রেজারার (treasurer) ছিলেন। সিপাহী বিদ্রোহের সময় ইন্দোর ট্রেজারী লুণ্ঠিত হয়। শুনা যায়, লুণ্ঠনের পর কানাই-এর মাতামহ মেথরের বেশে ট্রেজারীর ভিতরে ঢুকিয়া উহার অবস্থাদি দেখিয়া আসেন। পেনসন লইয়া তিনি কিছুদিন হুগলীতে থাকিবার

পব চন্দননগবে বাটী খরিদ কবেন এবং তথায় বসবাস করিতে থাকেন। হরকুমারবাবু জনৈক শিক্ষিত ভদ্রলোক ছিলেন। বোধ হয়, তখনকাব দিনে তাঁহাব বাটীতে তাঁহার নিজ অর্থে সংগৃহীত যে পুস্তকসমষ্টি ছিল তাহা চন্দননগরে অন্যত্র কোথাও ছিল না। তাঁহার পুস্তকসংগ্রহের মধ্যে Edinburgh Reviewএব সম্পূর্ণ সেট ছিল। এই সংগ্রহের বহু পুস্তক চন্দননগর পুস্তকাগারে স্থান পাইয়াছে। তখন-কাব দিনে প্রকাশিত সারবান বাঙ্গালা পুস্তকসকল তাঁহার সংগ্রহেব মধ্যে ছিল। কানাইলালের মাতামহদের সম্পত্তি বিভক্ত হইলে কানাইলালের অন্যতম মাতুল ৺নন্দলাল দত্তেব ভাগে চন্দননগবের বাটীটি পড়ে। এই নন্দবাবু এক-জন বিশিষ্ট অমায়িক ভদ্রলোক ছিলেন। তাঁহার বাটীর দ্বার ছিল অবারিত। তাঁহার বাগানের পিয়াবা, বেল, বাতাবি লেবু, ফলসা, জামরুল প্রভৃতি ফলসকল পাড়ার লোকে যে ভাবে খাইত ও ফেলিত, তাহাতে ঐ সকল ফলের গাছগুলি যেন সর্ব্বসাধারণের বলিয়াই মনে হইত।

নন্দকুমারবাবু একজন রসিক ও বসিকতাপ্রিয় লোক ছিলেন। তিনি একদিন তাঁহার নিকটে উপস্থিত ব্যক্তি-দিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'আচ্ছা বল দেখি, ঢাকের বাদ্যি কখন ভাল লাগে'? কেহ তাহার উত্তর দিতে না পারায় তিনি উত্তরটি বলিয়া দিলেন 'থাম্‌লে'।

কানাইলালের পিতা চুনিবাবুও খুব রসিক লোক ছিলেন।

তিনি দাবাবোড়ে খেলিতে বড় ভাল বাসিতেন। তাঁহার অতি-রিক্ত পানদোষ ছিল। বলিলে অত্যুক্তি হইবে না—সকল সময়েই তাঁহার মুখে মদের গন্ধ পাওয়া যাইত। এই পানদোষের জন্যই পেনসন লইবার বয়স না হইবার পূর্বেই তাঁহাকে বাধ্য হইয়া পেন্‌সন্‌ লইয়া চন্দননগরে চলিয়া আসিতে হইয়াছিল। পেনসনের টাকায় তাঁহার মদ্যপানের খরচাই কুলাইত না। কানাইলালের পড়ার খরচ চুনিবাবুর ছোট্ট ভাই রসিকবাবু বহন করিতেন।

কানাইএর বড় ভাই আশুবাবু ব্রাহ্মধর্ম্মমতাবলম্বী। তিনি বলেন—তখনকার হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মদিগের মার্জ্জিত আচার ব্যবহারে আকৃষ্ট হইয়া তিনি তাঁহাদের ধর্মমত গ্রহণ করেন।

কানাইলালের পৈতৃক ভবন ছিল হুগলী জেলার অন্তর্গত খরসরাই-বেগমপুরে।

১৯০৮ সালের ২রা মে তারিখের ভোরে কানাইলাল শান্তিপুরের শ্রীনিরাপদ রায়ের সহিত ১৫ নং গোপীমোহন দত্ত লেন হইতে ধৃত হন। এই বাটীতে কাগজে লিখিত 'বিস্ফোরক ফরমুলা' সকল, বোমাপ্রস্তুতপ্রণালী, Modern art of war, Mazzini ও Garibaldiর জীবন চরিত, 'বর্ত্তমান রণনীতি,' 'মুক্তি কোন পথে' প্রভৃতি কয়েকখান কাগজ ও পুস্তক পাওয়া গিয়াছিল।

চন্দননগরের "যুগান্তর" কিছু কিছু বিলি করিবার ভার কানাইএর উপর থাকিত। কানাই কলেজে এই পত্রিকা

লইয়া যাইয়া সহপাঠীদের পড়িয়া শুনাইত। ইতিহাসের ক্লাসে "যুগান্তরের" লেখা লইয়া অনেক সময় ইতিহাসের অধ্যাপকের সহিত আলোচনা হইত। রাজনীতিক বিষয়ের আলোচনায় যোগদানে কানাইএর বিশেষ আগ্রহ দেখা যাইত।

কানাইলালের কার্য্য ও আদালতে সত্যেন্দ্রের সহিত তাঁহার বিচার।

কানাইলাল যেভাবে নরেন্দ্রের প্রাণসংহার করিয়াছিলেন তাহার বিবরণ এইরূপ পাওয়া যায়—

রাজসাক্ষী হইবার পর নরেন্দ্রনাথকে বন্দী অবস্থায় সাহেব কয়েদীদের "ডিগ্রীতে" (কক্ষশ্রেণীতে) রাখা হইয়াছিল। সত্যেন্দ্রনাথ বসু নামক একজন আসামী—ইনি অরবিন্দবাবুর একজন আত্মীয়—গোসাঁইএর নিকট ২৯শে আগষ্ট তারিখে সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন যে তিনিও রাজসাক্ষী হইতে ইচ্ছুক। সত্যেন্দ্রের তখন জ্বর হওয়ায় তিনি জেলের হাঁসপাতালে অবস্থান করিতেছিলেন। সত্যেন্দ্র উক্ত অছিলা করিয়া পুনরায় ৩১শে আগষ্ট তারিখে সকালবেলা গোসাঁইকে আনাইয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিয়াছিলেন। গোসাঁইকে সত্যেন্দ্রের নিকট আসিতে দেওয়া হইয়াছিল। তখন গোসাঁইএর সহিত তাহার রক্ষীরূপে ছিল হিগিন্স নামক একজন সাহেব কয়েদী। পূর্ব্বদিন সন্ধ্যায় পীড়ার ভান করিয়া কানাইলাল হাঁসপাতালে ভর্ত্তি হইয়াছিলেন এবং সেই রাত্রে তাঁহাকে সত্যেন্দ্রের পার্শ্বে শুইতে দেওয়া হইয়াছিল। সত্যেন্দ্র উপরতলার বারন্দা হইতে গোসাঁইএর আগমনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। গোসাঁইকে আসিতে দেখিয়া তিনি চলিয়া যান। হিগিন্স

গোসাঁইকে উপরতলায় ছাড়িয়া ডিস্‌পেনসারির ভিতর প্রবেশ করে। গোসাঁই তথায় কানাই ও সত্যেন্দ্রকে দেখিতে পায়। কিছুক্ষণ পরেই ডিস্‌পেনসারীর ভিতরের লোকেরা একটি গুলির আওয়াজ শুনিতে পায়। একটু পরেই কানাই এবং সত্যেন্দ্রের দ্বারা অনুসৃত হইয়া গোসাঁই ডিস্‌পেন্‌সারী অভিমুখে ছুটিয়া যায়। হিগিন্স কানাইকে ধরিয়া ফেলে। হিগিন্স বলে, কানাইএর নিকট দুইটি রিভলবার ছিল—একটি ছোট ও একটি বড়। হিগিন্স কানাইএর হাত হইতে ছোট রিভলবারটি কাড়িয়া লইতে যাইলে, কানাইএর গুলিতে হাতে আহত হয় এবং পড়িয়া যায়। সে দাঁড়াইয়া উঠিয়া গোসাঁইকে ডিস্‌পেনসারী হইতে সিঁড়ি দিয়া নিচে পলায়ন করিতে দেখিয়া তাহার অনুসরণ করে। লিনটন্ নামক অন্য একজন সাহেব কয়েদী গুলির শব্দ শুনিয়া যে দিক হইতে শব্দ আসিতেছিল সেই দিকে যায় এবং অন্য কয়েদী হিগিন্সের সহিত গোসাঁইকে বারান্দা দিয়া তাহার দিকে আসিতে দেখিতে পায়। সে তখন সত্যেন্দ্রের সহিত কানাইকে তাহাদের পশ্চাতে আসিতে দেখে। উভয়েরই নিকট রিভলবার ছিল এবং কানাই জোরে জোরে এই কথা বলিতেছিল—আমি তোমাদের সকলকে গুলি করিব। লিনটন সত্যেন্দ্রের সহিত ধস্তাধস্তি করিবার সময় একটি গুলির আওয়াজ শুনিল এবং গোসাঁইকে পড়িয়া যাইতে দেখিল। সত্যেন্দ্র গুলি ছুঁড়িল। সত্যেন্দ্রকে লিনটন্ ধৃত করিয়া ফেলিয়া দিল এবং

তাহার নিকট হইতে রিভলবারটি কাড়িয়া লইল। এই সময় লিন্টনের সহিত কানাইলালের ধস্তাধস্তি হইল। লিনটন কানাইএর নিকট হইতে তাহার রিভলবারটি—যাহা কানাই-এর দক্ষিণ বাহুতে দড়ি দিয়া বাঁধা ছিল—কাড়িয়া লইবার পূর্ব্বেই নর্দ্দমায় পতিত গোসাঁইএর প্রতি কানাই আর একটি গুলি ছুঁড়িল। এই ধস্তাধস্তিব সময় কানাইএব রিভলবারের কুঁদোর আঘাতে লিনটন কপালে আহত হয়। অনুমান করা যাইতে পারে যে, যখন গুলি চলিতেছিল তখন সেখানে উপস্থিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে কেহই কোন সাহায্য দিতে পারে নাই। ছোট রিভলবারটি হইতে—যাহা সত্যেন্দ্রের নিকট ছিল—চারিটি গুলি ছোঁড়া হইয়াছিল এবং বড়টি হইতে—যাহা কানাইএর নিকট ছিল—পাঁচটি ছোঁড়া হইয়াছিল এবং উহাতে একটি কার্ট্রিজ অব্যবহৃত ছিল। বোধ হয় মোট নয়টি গুলি ছোঁড়া হইয়াছিল। গোলমালের জন্য ঠিক করিয়া বলা যায় না—কোন্‌টি কে ছুঁড়িয়াছিল। যাহা হউক, ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে সত্যেন্দ্র যখন লিন্টন কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া পড়ে তখন কানাই গোসাঁইএর পিঠে যে গুলি চালাইয়াছিল সেই গুলিতেই গোসাঁইএর মৃত্যু হইয়াছিল। হাঁসপাতালে গুলি চলিবার সময় একটি গুলিতে গোসাঁই তাহার উরুতে আহত হয়। এই সমস্ত ঘটনা সকাল সাতটা হইতে সাড়ে আটটার মধ্যে সংঘটিত হইয়াছিল।

কানাই ও সত্যেন্দ্রের বিচার যে সকল জুয়ার করিয়া

ছিলেন তাঁহাদিগের নাম—১। মিষ্টার নিকল্‌স্ ২। মিষ্টার ট্যালিস্‌লী ৩। শ্রীশশীভূষণ মুখার্জ্জী ৪। শ্রীহেমেন্দ্রনাথ ঘোষ ৫। শ্রীবিপিনবিহারী ভট্টাচার্য্য। ইঁহারা সকলেই কানাইকে দোষী সাব্যস্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ অধিকাংশের মতে নির্দ্দোষ সাব্যস্ত হইয়াছিলেন। ভারতীয় জুরার তিনজনই সত্যেন্দ্রকে নিরপরাধ স্থির করেন। হাই-কোর্টের মতামতের জন্য বিচারের ফল হাইকোর্টে প্রেরিত হইলে কানাই ও সত্যেন্দ্র উভয়েই ফাঁসীদণ্ডে দণ্ডিত হন।

হত্যাঘটনার পর কানাইলাল প্রথমে যে বিবৃতি দেন তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন—গোসাঁইকে তিনি ও সত্যেন্দ্র উভয়ে মিলিয়া হত্যা করিয়াছিলেন, কিন্তু পরে তিনি সে বিবৃতি প্রত্যাহার করিয়া হত্যার জন্য একমাত্র নিজেকেই দায়ী করিয়াছিলেন। কেন তিনি গোসাঁইকে হত্যা করিয়াছেন তাহা জিজ্ঞাসিত হইলে কানাইলাল প্রথমে কারণ দিতে চাহেন নাই, কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই তিনি বলেন—"হাঁ, কারণ দিতে চাই। গোসাঁই দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে, সেইজন্য আমি তাহাকে হত্যা করিয়াছি।"

সত্যেন্দ্রের পক্ষের উকিল ছিলেন এ. সি. ব্যানার্জ্জী। তিনি কিরূপ উদ্যম ও দক্ষতার সহিত সত্যেন্দ্রনাথকে বাঁচাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহা একটি পৃথক্ অধ্যায়ে বর্ণিত হইবে। উহার বিবরণ দেওয়াটা খুব প্রাসঙ্গিক না হইলেও, আশা করি, পাঠকগণ উহা পড়িয়া বৃথা সময় নষ্ট হইল

বলিয়া মনে করিবেন না।

বিচারক রায় শুনাইবার পর কানাইলালকে জিজ্ঞাসা করেন —তিনি আপিল করিবেন কিনা। কানাইলাল তৎক্ষণাৎ উত্তর করেন "There shall be no appeal" "আপিল হইবে না।" কানাইলালের দণ্ডপ্রাপ্তির পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত আশুতোষ দত্ত তাঁহার ভ্রাতাকে, রাজার নিকট প্রাণভিক্ষা করিবার প্রার্থনা করাইবার জন্য, অনুরোধ করিবার উদ্দেশ্যে জেলে গিয়া কানাইলালের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন; কিন্তু সাক্ষাৎকারকালে কানাইলালের অবিচলিত, স্থির ও দৃঢ় মনোভাব দেখিয়া সেরূপ কোন প্রস্তাব করিতে তিনি লজ্জাবোধ করিয়াছিলেন। কানাইলাল দণ্ডাজ্ঞা শুনিয়া একটুও বিচলিত না হইয়া একটি মধুর হাসি হাসিয়াছিলেন।

যে রিভলবারের গুলি গোসাঁইএর পৃষ্ঠ বিদ্ধ করিয়াছিল তাহার "বোর" ছিল ৩·৮০, "মেকার" চার্লস্ অস্‌বোর্ণ এবং অন্য রিভলবারটির "বোর" ছিল ৪·৫০ ও "মেকার" ছিল আইরিশ্ কনস্‌ট্যাবুলারী। যে গুলিতে গোসাঁইএর মৃত্যু হইয়াছিল তাহা তাহাকে নিম্নোক্তভাবে বিদ্ধ করিয়াছিল, "The bullet that caused Goswami's death entered his back just beneath the left shoulder blade, pierced the vertebræ severing the spinal cord, passed through the right lung and finally spent

itself out beneath the skin in the right chest."

সরকারপক্ষের উকিল নিম্নলিখিত মন্তব্যদ্বারা তাঁহার বক্তৃতা শেষ করেন :—কানাইএর বিরুদ্ধে উপস্থাপিত প্রমাণাবলী অপরিমিত। হইতে পারে যে, যে-উদ্দেশ্যে সে এই কার্য্য করিয়াছে তাহা উদ্‌বুদ্ধদেশপ্রেমজাত এবং তাহার দৃষ্টিতে গোসাঁই বিশ্বাসঘাতকও হইতে পারে এবং সেই কারণে গোসাঁইএর মৃত্যুও তাহার প্রাপ্য হইতে পারে; কিন্তু তাই বলিয়া আসামী হত্যাপরাধ হইতে মুক্ত হইতে পারে না। অন্যপক্ষে ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে আসামী এই কার্য্য করিয়া পরম গৌরবই অনুভব করিতেছে।

বিচারক কানাইকে সম্বোধন করিয়া জুরিদের রায় শুনাইলেন—তোমাকে এই সাজা দেওয়া হইল যে, তুমি যতক্ষণ না মৃত অবস্থা প্রাপ্ত হও ততক্ষণ তোমার গলায় রজ্জু দিয়া তোমাকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলাইয়া রাখা হইবে। রায় শুনিয়া কানাইলাল একটুও বিচলিত না হইয়া সুখের হাসি হাসিলেন এবং তাঁহার হাবভাবে পূর্ব্বোক্তরূপ চিত্তস্থিরতা ও পরম আত্মত্যাগের ভাব পরিলক্ষিত হইল। আদালতে যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা সকলেই কানাই-এর চিত্তস্থিরতা দেখিয়া একেবারে বিস্ময়বিমুগ্ধ হইলেন।

কানাইএর সহিত একই অপরাধে অভিযুক্ত সত্যেন্দ্রের পক্ষের উকিল শ্রীযুক্ত এ. সি. ব্যানার্জির বক্তৃতা এবং বিচারপতির মন্তব্যাবলী

শ্রীযুক্ত এ. সি. ব্যানার্জী বলেন—সত্যেন্দ্র যে কানাই-এর মতই তুল্যাপরাধে অপরাধী তাহা প্রমাণ করিবার জন্য সরকারের পক্ষের উকিল বহুক্ষণ ধরিয়া যে বক্তৃতা করিয়াছেন তাহা জুরারগণ শুনিয়াছেন। সংবাদপত্রে গোসাঁইএর মৃত্যু সম্বন্ধে যাহাকিছু প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা হইতে সত্যেন্দ্রের সহযোগিতা বা অসহযোগিতা বিষয়ে যদি তাঁহারা কোন মতামত গঠন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি প্রথমেই জুরিকে তাঁহাদের মন হইতে তাহা দূর করিয়া দিতে অনুরোধ করিতেছেন। ক্ষতি যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে—কেন না তাঁহার যতটা স্মরণ হইতেছে তাহা হইতে বলা যাইতে পারে যে সংবাদপত্রের রিপোর্ট সত্য তথ্য লইয়া সঙ্কলিত হয় নাই, বরং তিনি এখন দেখিতেছেন যে, উহাদ্বারা সত্যেন্দ্রের অনিষ্টই সাধিত হইতে পারে। তাঁহাদের সেই মতামত যাহাই হউক না কেন, তিনি তাঁহাদিগকে অনুরোধ করিতেছেন তাঁহারা যেন বিচারালয়ের চতুঃসীমার বাহিরে যাহা পাঠ করিয়াছেন বা যাহা শুনিয়াছেন

তাহা গ্রাহ্য না করিয়া কেবলমাত্র যে সকল প্রমাণ আদালতে উপস্থাপিত হইয়াছে তাহারই উপর নির্ভর করিয়া বিচার করেন। তাঁহাদের সমক্ষে যে সকল প্রমাণ উপস্থাপিত হইয়াছে তাহা হইতে তাঁহারা যদি অবিসম্বাদিতরূপে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে সত্যেন্দ্র অপরাধী, তাহা হইলেই নিঃসন্দেহে তাঁহারা তাহাকে অপরাধী সাব্যস্ত করিবেন। কিন্তু তাঁহাদের বিচারবুদ্ধিতে সত্যেন্দ্রের অপরাধসম্বন্ধে

একটুও সন্দেহ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তাঁহারা যেন তাহাকে সন্দেহের সুবিধাজনক ফলভোগ হইতে বঞ্চিত না করেন। সকল অবস্থার পর্য্যালোচনা করিয়া যদি তাঁহারা দেখেন যে উহা তাহার নির্দোষিতা সমর্থন করিতেছে না' তাহাহইলেই তাঁহারা তাহাকে অপরাধী সাব্যস্ত করিবেন। সত্যেন্দ্র যে উদ্দেশ্য লইয়া দুঃসাহসিক কার্য্যটি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তাহা লইয়া সরকার পক্ষের উকিল দীর্ঘ আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, গোসাঁই দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে বলিয়া কানাই ও সত্যেন্দ্র তাহাকে ধরাপৃষ্ঠ হইতে অপসারিত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল। গোসাঁই যে দ্বিতীয় আসামীদল সম্বন্ধেও সাক্ষ্য দিবে তাহা কি সত্যেন্দ্র জানিত? আসামীগণ পৃথক্ পৃথক্ দুইটি দলভুক্ত ছিলেন এবং গোসাঁই ছিলেন প্রথম দলভুক্ত। সত্যেন্দ্র এ সম্বন্ধে কিছুই জানিত না। যে প্রথম আসামী-দলের বিরুদ্ধে গোসাঁই সাক্ষ্য দিয়াছিল কানাই তাহার

অন্তর্ভুক্ত ছিল। মিষ্টার উইথল সত্যেন্দ্রের সহিত দেখা করিবার জন্য মিষ্টার বার্লির নিকট দুইবার দরখাস্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু যখন এই দুইখানি দরখাস্ত করা হইয়াছিল তখন সত্যেন্দ্র পীড়িত। অতএব সত্যেন্দ্র যে সকল বিষয় জানিত এবং গোসাঁইকে হত্যা করিবার অভিপ্রায় যে তাহার ছিল, কেবল সরকারপক্ষের উকিলের উক্তি ভিন্ন উহার অন্য কোন প্রমাণ একেবারেই নাই। উপরন্তু কানাইএর সহিত সত্যেন্দ্রের যে জানাশুনা ছিল তাহারও কোন প্রমাণ নাই। কানাই ছিল প্রথম দলের আসামী এবং সত্যেন্দ্র ছিল দ্বিতীয় দলের আসামী। তাহাদের মধ্যে যে পরস্পরের জানাশুনা ছিল তাহা প্রমাণ করিবার কোন চেষ্টা করা হয় নাই। সত্যেন্দ্র জেলে আসিয়াই হাঁসপাতালে ভর্ত্তি হইয়াছিল এবং কানাইএর নিকট যাইয়া তাহার সহিত কথা বলিবার সুযোগও সে পায় নাই। গোসাঁইকে হত্যা করিবার জন্য একটি ষড়যন্ত্র গড়িয়া উঠিবার পূর্ব্বে তাহাদের পরস্পরের মধ্যে জানা শুনা থাকা আবশ্যক কিংবা কথা চালাচালি করিবার মত সুযোগ পাওয়া তাহাদের আবশ্যক। হাঁসপাতালে ভর্ত্তি হইয়া পৃথক্‌ভাবে থাকিবার প্রথম দিবস হইতে গোসাঁইএর মৃত্যুদিবস পর্য্যন্ত সত্যেন্দ্র গোসাঁইএর মনে এইরূপ আশা জাগাইয়া রাখিয়াছিল যে সে কোনও দিন রাজসাক্ষী হইয়া গোসাঁইএরই মত গভর্ণমেণ্টের কাজে আসিতে পারে—এই বিষয়টিকে খুব

অন্যায়রকমভাবে বড় করিয়া দেখাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। গোসাঁইকে হাঁসপাতালে আনিয়া হত্যা করিবার উদ্দেশ্য লইয়া সত্যেন্দ্র যে গোসাঁইএর মনে মিথ্যা আশার সৃষ্টি করিয়াছিল তাহার প্রমাণ কোথায়? যদি প্রকৃতই সত্যেন্দ্রের এই ইচ্ছাই ছিল, কানাই আসিবার পূর্ব্বে তাহা পূরণ করিবার তাহার প্রচুর সময় ছিল। সত্যেন্দ্র একমাস বা ততোধিক-কাল সেখানে ছিল এবং গোসাঁইএর সহিত তাহার খুব সদ্‌ভাব ছিল বলিয়াই সে কখনও তাহার সহিত রূঢ় ব্যবহার করে নাই। গোস্বামী নিজের ইচ্ছামত তাহার সহিত মাঝে মাঝে দেখা করিত। কানাইএর যে উদ্দেশ্য ছিল, সত্যেন্দ্রেরও যে সেই একই উদ্দেশ্য ছিল তাহা বলিতে পারা যায় না। মোকদ্দমার বিষয়টি বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া শ্রীযুক্ত ব্যানার্জ্জী মন্তব্য করেন যে, সত্যেন্দ্রের সহযোগিতার বা ষড়-যন্ত্রের কোনই প্রমাণ নাই। উপসংহারে শ্রীযুক্ত ব্যানার্জ্জী বলিলেন যে, জুরারগণ যদি মনে করেন যে মোকদ্দমার যেরূপ বিবরণ পাওয়া যাইতেছে তাহা হইতে তাঁহারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন যে সত্যেন্দ্রের আচরণ ও কার্য্যাবলী তাহার নির্দোষিতা প্রমাণের অন্তরায় নহে, তাহা হইলে তাঁহারা সত্যেন্দ্রকে নির্দ্দোষী সাব্যস্ত করিবেন। অন্য সময় অপেক্ষা বর্ত্তমান রাজনীতিক উত্তেজনার সময়ে ইহা দেখা নিতান্তই আবশ্যক যে, যে-মোকদ্দমার ফলে কাহারও প্রাণদণ্ড হইতে পারে তাহার বিচার যেন সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হইতে পারে।

নিঃসন্দেহে ইহা বলা যাইতে পারে, ব্রিটিশ বিচারের উপর এককালে দেশে যে অগাধ বিশ্বাস ছিল তাহা একরূপ চলিয়া যাইতে বসিয়াছে; কিন্তু এখনও সেই বিশ্বাস আবার ফিরিয়া আসিবে কিনা তাহা বর্ত্তমান বিচারক এবং বর্ত্তমান জুরারগণের উপর নির্ভর করিতেছে।

বিচারক বলিলেন—ইহা পাওয়া যাইতেছে যে ৩০শে আগষ্টের রাত্রে আসামী দুইজন হাঁসপাতালে পাশাপাশি শয়ন করিয়াছিল। ইহাও পাওয়া যাইতেছে যে, ৩০শে তারিখ পর্য্যন্ত নরেন্দ্রের সহিত কথা কহিবার বিষয় সম্বন্ধে কানাই ও সত্যেন্দ্রের মধ্যে কোন আলোচনা হইতে পারে নাই এবং ইহার বিরুদ্ধেও কোন প্রমাণ নাই। তাহার পর পাওয়া যাইতেছে যে ৩০শে তারিখে সত্যেন্দ্রের জ্বর হইয়াছিল। তাহার শরীরের তাপ ছিল ১০০ ডিগ্রী এবং সে সেই দিন কিছুই করিতে পারে নাই।

কিন্তু ৩১শে তারিখের ঘটনা সম্বন্ধে—সেইদিন প্রাতঃকালে ৭টা হইতে ৭॥০টার মধ্যে যাহা ঘটিয়াছিল—তাহার একটি পরিষ্কার বিবরণ হিগিন্স দিয়াছে। হিগিন্সের সাক্ষ্য সম্বন্ধে জুরিকে যাহা মনে রাখিতে হইবে তাহা হইতেছে এই—নরেন্দ্র হিগিন্সের জিম্মায় ছিল। নরেন্দ্রকে নিরাপদে রাখিবার দায়িত্ব হিগিন্সের উপর অর্পিত ছিল এবং হিগিন্সের জিম্মায় থাকিবার কালেই যখন নরেন্দ্রের মৃত্যু সংঘটিত হইয়াছে, তখন কি করিয়া নরেন্দ্র ডিস্পেন্সারিতে আসিল

তাহার সঠিক বিবরণের জন্য হিগিন্সের উপর নির্ভর করা যাইতে পারে না। নরেন্দ্রের ডিস্‌পেন্‌সারিতে যাওয়াই তাহার মৃত্যুর কারণ। হিগিন্স বলিয়াছে যে, সে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের অনুমোদন লইয়া নরেন্দ্রকে হাঁসপাতালে যাইতে দিয়াছিল, কিন্তু এইরূপ কোন প্রমাণ উপস্থাপিত করা হয় নাই। জুরিকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে হিগিন্সই নরেন্দ্রকে মৃত্যু-পথে আনয়ন করিয়াছে এবং হিগিন্সকে সেই অভিযোগ হইতে মুক্ত হইতে হইবে। অতএব যখন বলা হইতেছে যে নরেন্দ্র একজন লোকের মুখ হইতে তাহার আহ্বানের কথা জানিতে পারিয়াছিল এবং হিগিন্সেরই স্বার্থে হিগিন্স বলিয়াছে যে সে নরেন্দ্রকে হাঁসপাতালে আসিবার জন্য সংবাদ পাঠায় নাই। নরেন্দ্র নিজের ইচ্ছায় হাঁসপাতালে গিয়াছিল এবং সে তাহাকে তথায় যাইতে পারতপক্ষে নিষেধ করিয়াছিল।

যদি এই সাক্ষ্য সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হয় তাহা হইলে পাওয়া যাইতেছে যে হিগিন্স এবং নরেন্দ্র হাঁসপাতালে গিয়াছিল। হিগিন্স বলিয়াছে যে, সে সত্যেন্দ্রকে উঠানের দিকে মুখ করিয়া উপরতলার বারান্দায় দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়াছিল। সত্যেন্দ্র তাহাদিগকে আসিতে দেখিয়া অগ্রসর না হইয়া ফিরিয়া গিয়াছিল এবং হিগিন্স ইহাও বলিয়াছে যে সে বারান্দায় সত্যেন্দ্রকে দেখে নাই—দেখিয়াছিল কানাইকে। এটি সত্যই বড় গুরুত্বপূর্ণ কথা। যদি তাঁহারা হিগিন্সের এই কথায় বিশ্বাসস্থাপন করেন, তাহা হইলে ইহার প্রকৃত অর্থ কি

তাহা তাঁহাদিগকে বুঝিতে হইবে। ইহা হইতে কি ইহাই বুঝিতে হইবে যে সত্যেন্দ্র কানাইকে তাহার স্থান গ্রহণ কবিতে দিয়া চলিয়া গিয়াছিল ? যদি সত্যেন তাহাই করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহা হইতে কি ইহাই স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে কানাই কিজন্য তাহার স্থান লইতেছে তা'হা সত্যেন্দ্র জানিত। বিভিন্ন দিকের মধ্যস্থিত এই সকল পরস্পব-বিরোধী প্রমাণসকলের মধ্যে কোন্‌টির উপর কতটা নির্ভর করা যাইতে পারে তাহাও তাঁহাদিগকে বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। কেমন করিয়া জুবারগণ নিজেরাই জেলের ভিতবে আসিয়াছেন, বিচারপতি তাহা জুরারদিগকে স্মরণ করিতে বলিলেন। তাঁহারা কি বলিতে পারেন যে তাঁহারা যখন জেলের ফটকের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন তখন সেখানে কয়জন ওয়ার্ডার 'ডিউটিতে' ছিলেন ? জুরারগণ কি নির্ভুলভাবে বলিতে পারেন· কে প্রথমে জেলের ফটক দিয়া প্রবেশ করিয়াছিল ? কখন মিঃ এমার্সন তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন ? কে সাহেবকয়েদীদের ওয়ার্ডে ছিল ? কে কম্‌পাউণ্ডারের ঘরে ছিল ? চেয়ারের তলায় গুলির আঘাতের চিহ্ন কে দেখাইয়া দিয়াছিল ? আর, এক্ষেত্রে জুরারগণ সেখান-কার সকল বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া দেখার জন্যই সেখানে গিয়াছিলেন এবং যাহা তাঁহারা দেখিয়াছিলেন তাহা নির্ভুল-ভাবে মনে করিয়া রাখিবার জন্যই সেখানে গিয়াছিলেন। এই সকল সহজ বিষয়গুলি যদি তাঁহারা মনে না রাখিতে পারেন,

তাহা হইলে কি করিয়া তাঁহারা আশা করিতে পারেন যে, সেখানে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল তাহা অশিক্ষিত সাক্ষীরা মনে রাখিতে পারিবে এবং প্রতি পদে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল তাহা তাহারা পর্য্যায়ক্রমে গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত কি করিয়া বর্ণনা করিতে সক্ষম হইবে? উপসংহারে বিচারক সংবাদপত্রে যাহা কিছু বলা হইয়াছে জুরারগণকে তাহা তাঁহাদের মন হইতে অপসারণ করিতে বলিলেন। এই অপরাধটি প্রশংসনীয় অথবা নিন্দনীয় অথবা ইহা অন্য কোনরূপ অপরাধ—সে কথাও তাঁহারা তাঁহাদের মন হইতে বিদূরিত করুন। তাঁহাদিগকে কেবল বলিতে হইবে যে আইনের চক্ষে ইহা হত্যা কি না। এই বিষয়ে যদি কোনরূপ সন্দেহ থাকে, তাহা হইলে অভিযুক্তকে তাঁহারা তাঁহাদের সন্দেহের সুবিধাজনক ফল হইতে বঞ্চিত করিবেন না। অপরাধ সম্বন্ধে যদি তাঁহাদের আদৌ কোন সন্দেহ না থাকে, তাহা হইলে তাঁহারা তাঁহাদের বিবেকানুযায়ী তাঁহাদের মত জানাইবেন।

এই প্রসঙ্গে একটি প্রধানতম কথা উক্ত থাকিলে ভাল হয়। পাবলিক প্রসিকিউটার বিশ্বাস মহাশয় সত্যেন্দ্রের বিরুদ্ধে সংগৃহীত প্রমাণাদি উপস্থাপিত করিয়া পরিশেষে বলিয়াছিলেন —সত্যেন্দ্র এই ব্যাপারে একটিও গুলি না ছুঁড়িলেও সে কানাইএর মতই গোসাঁইএর হত্যার জন্য সমভাবে দায়ী। অবশ্য জুরারগণের এই বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিলে তাহার ফলভোগ হইতে সত্যেন্দ্রকে বঞ্চিত করা উচিত নহে। কিন্তু

বিচারক বলিলেন যে এই সম্পর্কে একটি মস্ত বড় কথা হইতেছে এই যে যখন কানাই সত্যেন্দ্রকে ম্যাজিষ্ট্রেটের সমক্ষে এই ব্যাপারে জড়াইয়াছিল তখন সত্যেন্দ্র তাহাতে আপত্তি করে নাই। যদি সত্যেন্দ্র নির্দোষী হইত তাহা হইলে কানাইলালের উক্তিতে সে নিশ্চয়ই আপত্তি করিত।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে অধিকসংখ্যক জুরাব সত্যেন্দ্রকে নিরপরাধ সাব্যস্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের এই রায় হাইকোর্টকর্ত্তৃক পর্য্যবেক্ষণের জন্য প্রেরিত হইলে হাইকোর্ট তাহা সমর্থন না করিয়া সত্যেন্দ্রেরও উপর সর্ব্বোচ্চ দণ্ড অর্থাৎ ফাঁসীর হুকুম দিয়াছিলেন।

সত্যেন্দ্রকে বাঁচাইবার জন্য ব্যানার্জ্জী মহাশয়ের চেষ্টা পরিণামে ব্যর্থ হইলেও তাঁহার বক্তৃতায় তাঁহার গুণপনা ও বিশেষ কৃতিত্ব প্রকাশ পাইয়াছিল।

কানাইলালের ফাঁসি ও তাঁহার মৃতদেহের সৎকার

(১৩১৫ বঙ্গাব্দের ২৭শে কার্ত্তিক তারিখের সঞ্জীবনী হইতে উদ্ধৃত)

গত মঙ্গলবার প্রত্যুষে যখন দিবা-অরুণালোকে পূর্ব্বাকাশ উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছিল সেই পবিত্র সন্ধিক্ষণে কানাইলাল ইহলোক ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। ৫টার সময় পুলিশের ৩০০ সশস্ত্র শাস্ত্রী জেলে সমবেত হইল। ৫৷৷০টার সময় পুলিশ কমিশনার মিষ্টার হ্যালিডে, ডেপুটি পুলিশ কমিসনর, আলিপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট মিষ্টার বোমপাস জেলে উপস্থিত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পবে কয়েকজন অনুগ্রহভাজন সংবাদ-পত্রেব রিপোর্টার ও দর্শক বধ্যভূমির একস্থলে প্রবেশাধিকার পাইলেন। ক্ষীণ চন্দ্রালোকে সকলে নীরবে সময়ের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

পূর্ব্বাকাশ অরুণরাগে রঞ্জিত হইয়া উঠিল। জেলেব ঘড়িতে ৬টা বাজিয়া গেল—কানাইলালের কারাকক্ষের দ্বার উন্মুক্ত হইল। মিঃ বোম্পাস, পুলিসেব ডেপুটি কমিশনর প্রভৃতি মিছিলবদ্ধ হইয়া কানাইলালকে লইয়া বধ্যভূমির দিকে অগ্রসর হইলেন। কানাইলালের দুই হস্ত পৃষ্ঠদেশে বদ্ধ। দৃঢ়পদে নির্ভিকভাবে কানাইলাল অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অস্ফুট আলোকের ভিতর দিয়া কানাইএর চক্ষুদ্বয়ের প্রশান্ত জ্যোতি দৃষ্ট হইতেছিল। শান্তোজ্জ্বল হাসিতে কানাইএর বদনে কি এক স্নিগ্ধ আভা ফুটিয়া উঠিয়াছে।

কানাই বধ্যমঞ্চে আরোহণ করিল। একবার চারিদিকে দর্শকদিগের দিকে সস্মিত দৃষ্টিনিক্ষেপ করিল। তাহার সেই পরম নিশ্চিন্ত নির্ভিকভাব, সেই স্মিত বদন, দর্শকদিগকে বিস্ময়বিমুগ্ধ করিল। কানাইএর গলায় ফাঁসির রজ্জু অর্পণ করা হইল। কানাই একান্ত নিরুদ্বেগ নিশ্চিন্ত, কেবল একবার মৃদুস্বরে জল্লাদকে বলিল—"দড়িটা বড় কড়া হয়েছে, গলায় লাগ্‌ছে।" আবার ঠিক করিয়া ফাঁসী পরান হইল। আবরণ দিয়া তাহার মুখ ঢাকিয়া দেওয়া হইল। জল্লাদ তখন দ্রুত-পদে নামিয়া আসিয়া ফাঁসিকাষ্ঠ ঝুলাইয়া দিল—মুহূর্ত্তমধ্যে কানাই অনন্তলোকে চলিয়া গেল। ৯টার কিঞ্চিৎ পরে কানাইএর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও স্বজন স্বদেশীগণ মৃতদেহ জেলের বাহিরে বহন করিয়া আনিলেন। জেলের বাহিরে ইতিমধ্যে অসংখ্য লোক কানাইএর মৃতদেহ বহনে ও অন্ত্যেষ্টিতে যোগদান করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। খট্টার উপরে সুন্দর সুরভি পুষ্পদামের উপর কানাইএর দেহ স্থাপন করা হইল। কানাইএর বুকের উপর একখানি গীতা স্থাপন করা হইল। তারপর সকলে সেই শবাধার বহন করিয়া কালীঘাটের দিকে চলিলেন। এইখানকার দৃশ্য প্রকৃতই অবর্ণনীয়। বৃক্ষের চূড়ায়, গৃহের ছাদে সর্বত্র জনসমষ্টি। অল্পক্ষণমধ্যে বীরপূজামত্ত এক বিরাট মিছিল শ্রদ্ধাপ্লুতচিত্তে কানাইএর শবের সঙ্গে সঙ্গে শ্মশানক্ষেত্রে উপস্থিত হইল। হাজার হাজার লোক—পুরুষ, স্ত্রীলোক, বালক—আজ কানাইএর

শ্মশানে উপস্থিত হইয়াছেন। সম্ভ্রান্ত ভদ্রপরিবারের মহিলাগণ, অশীতিপর বৃদ্ধা—আজ সকলে কানাইএর পদধূলি মস্তকে লইলেন। সঙ্গীতধ্বনি হইল, "যায় যাবে জীবন চলে, জগৎমাঝে তোমার কাজে বন্দে মাতরম্ বলে।" শ্মশানে কানাইএর সংক্ষিপ্ত জীবনী বিবৃত হইল—তাঁহার আত্মার কল্যাণার্থে প্রার্থনা করা হইল। কানাইএর শবদেহের ফটো লওয়া হইল। পুষ্পমাল্যে সে দেহের প্রায় সর্বাংশ ঢাকিয়া গিয়াছে, কেবল তাঁহার মুখের কিয়দংশ দেখা যাইতেছে—সে মুখে এখনও হাসি লাগিয়া রহিয়াছে। চন্দনকাষ্ঠে চিতা সজ্জিত হইল, তদুপরি ঘৃতলিপ্তদেহ স্থাপিত হইল। কানাইএর ভ্রাতা অগ্নিসংযোগ করিলেন. অল্পক্ষণ মধ্যেই সব শেষ হইল!

রৌপ্যাধারে চিতাভস্ম গৃহে আনিয়া সযত্নে রক্ষিত হইল। অনেকে কানাইএর চিতাভস্ম লইয়া গেলেন। একজন গাহিলেন—

ভাই কানাই, যাওরে অনন্তধামে।
মোহ মায়া পাশরি,
দুঃখ আঁধার যেথা কিছুই নাহি।
যায় যথা সত্যব্রত, বীরব্রত, পুণ্যবান,
যাও তুমি যাও সেই দেব সদন।

ইংলিশম্যান সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিবরণ

একজন বাঙ্গালী সংবাদদাতা কর্ত্তৃক লিখিত। (অনুবাদ)

শুনা গেল যে, যে সকল স্ত্রীলোক কানাইলালের মৃতদেহ দাহ করিবার কার্য্যে যোগদান করিয়াছিলেন তাঁহারা ভদ্র-পরিবারের স্ত্রীলোক। মৃতদেহ দর্শনে তাঁহাদের চক্ষু অশ্রু-ভারাক্রান্ত হইয়াছিল এবং অনেককে গভীর শোকাভিভূতের ন্যায় ক্রন্দন করিতে দেখা গিয়াছিল। পুরোহিত বিশ্বরঞ্জন বাবু চাঁদা তুলিয়া কয়েক মন চন্দনকাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কেওড়াতলা ঘাটে যে বৃহৎ জনতা সমবেত হইয়াছিল তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই স্বেচ্ছায় দুই তিন টাকা করিয়া চাঁদা দিয়াছিলেন। কেহ কেহ দশ টাকা পর্য্যন্তও দিয়াছিলেন এবং এইরূপে প্রায় তিনশত টাকা চন্দনকাষ্ঠ সংগ্রহেই খরচ করা হইয়াছিল। দেহ পুড়িয়া যাইবার পর, পোড়া হাড়গুলি টুকরা টুকরা করিয়া লোকে স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ লইয়া গিয়াছিল। টুকরাগুলি লইবার জন্য একেবারে হুড়াহুড়ি পড়িয়া গিয়াছিল। দেহ জ্বালাইবার পূর্বে কানাইএর মাথার চুল দর্শকেরা কাটিয়া লইয়া রাখিয়াছিলেন। ছাই গঙ্গায় না ফেলিয়া, বহু ভক্ত তাহা আগ্রহসহকারে কাচ ও রূপার পাত্রে ভরিয়া লইয়াছিল। কিছু ছাইএর মোড়কও করা হইয়াছিল—বোধ হয় বাহিরে পাঠাইবার জন্য। একজন ভদ্রলোক উহা সোনার পাত্রে ভরিয়া লইয়াছিলেন। কানাইএর ভ্রাতা যে কাষ্ঠ

সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহা জনতা ফেলিয়া দিয়াছিল এবং কানাইএর মৃতদেহ কেবল চন্দনকাষ্ঠে ও শ্রেষ্ঠ সুগন্ধি ঘৃতে পোড়ান হইয়াছিল। কালীদেবীকে উৎসর্গীকৃত দুগ্ধ, নারিকেল জল, পুষ্প ইত্যাদি কানাইএর মুখে ঢালিয়া দেওয়া হইয়াছিল। দলে দলে মন্দিরে আগত পুষ্পবিক্রেতারা বিনামূল্যে তাহাদের পুষ্পাদি উপহার দিয়াছিল।

কানাইলাল প্রকৃত বীরের মত মৃত্যু বরণ করিয়া লইয়াছেন। যখন ফাঁসীর রজ্জু তাঁহার গলদেশে পরাইয়া দেওয়া হইতেছিল তখন তিনি সোজা দৃঢ়ভাবে দাঁড়াইয়া ছিলেন। শুনিলাম যে তিনি জল্লাদকে গল-রজ্জুটি ঠিকভাবে পরাইতে বলিয়াছিলেন এবং নিজহস্তে উহা পরিবার সময় তাঁহার চিত্তের যে স্থিরতা ও দৃঢ়তা দেখা গিয়াছিল তাহাতে সকলে অতীব বিস্মিত না হইয়া থাকিতে পারেন নাই। তাঁহার মুখমণ্ডল নির্ম্মল হাস্যে উদ্দীপ্ত হইয়াছিল এবং যতক্ষণ না তাঁহার পার্থিব দেহ ভস্মে পরিণত হইয়াছিল ততক্ষণ পর্য্যন্ত সেই হাস্য সকলেই তাঁহার মুখমণ্ডলে দেখিতে পাইয়াছিলেন।

পাঁচ ফুট গভীরে কানাইকে পাতিত করা হইল। এক ঘণ্টা পরে দড়ি কাটিয়া তাঁহার দেহ নামান হইল এবং ডাঃ নীল ময়না তদন্ত করিলেন। জুরারগণ তদ্দণ্ডে 'মৃত্যু' রায় দিলেন। ঠিক সাড়ে নয়টার সময় কানাইলালের মৃতদেহ বহন করিয়া লইয়া যাওয়া হইল এবং একখানি গীতা তাঁহার বক্ষের উপর স্থাপিত হইল। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এবং তাঁহার বহু বন্ধু ও আত্মীয় তাঁহার দেহ খাটে করিয়া বহন করিয়া লইয়া গেলেন। বহু সহস্র লোকদ্বারা গঠিত একটি শোভাযাত্রা করিয়া কানাইলালের দেহ কালীঘাট-শ্মশানে আনা হইল। একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ মন্দির হইতে ফুলের মালা আনিয়া মৃতের গলায় পরাইয়া দিলেন।

যাহাতে কানাইএব আত্মা স্বর্গে চিরস্থায়ী শান্তিলাভ করিতে পারে তাহাব জন্য বিশেষ কবিয়া প্রার্থনা করা হইল। শ্মশান-দৃশ্যের বিরাটত্ব বর্ণনার অতীত। সকল শ্রেণীর ও সকল অবস্থাব স্ত্রী পুরুষ অদ্‌ভুত ও অসাধারণ ব্যক্তিটিকে শেষ দেখা দেখিবাব জন্য হাজাবে হাজারে সমবেত হইয়াছিলেন। দাহ করিবাব পূর্বে ঘাটে যখন কানাইলালের দেহ রক্ষিত হইয়াছিল, তখন কানাইএব মুখে সম্ভ্রান্ত ঘরের মহিলাবা কালীমাতাব চবণামৃত ঢালিয়া দিয়াছিলেন। যাঁহারা শোভাযাত্রাব অনুসবণ কবিয়াছিলেন তাঁহাদের সকলকে নগ্নপদে শ্মশানে যাইতে দেখা গিয়াছিল। মৃতদেহে হরিদ্রা ও ঘৃত মাখান হইয়াছিল এবং ঘাটে ধূপ ধূনা জ্বালা হইয়াছিল। দ্বিপ্রহবে ঐ স্থানের ফটো লওয়া হইয়াছিল এবং কানাইলালের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মৃতদেহে অগ্নিসংযোগ করিয়াছিলেন। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যাঁহারা যোগদান করিয়াছিলেন তাঁহাবাও এই কার্য্য করিয়াছিলেন। আমাদিগের প্রতিনিধি আমাদিগকে জানাইলেন যে, কেবল ঘৃত ও চন্দনকাষ্ঠ দ্বারা কানাইলালেব দেহ দাহ করা হইয়াছিল।

শবদাহকালে মুহুর্মুহু গভীরভাবোদ্দীপনামূলক "বন্দেমাতরম্‌" ধ্বনি গগণ বিদীর্ণ করিতেছিল এবং মধ্যে মধ্যে দেশপ্রেমোদ্বোধক গীতিসকল গীত হইতেছিল। আমাদের প্রতিনিধি বলিলেন যে দাহকার্য্য শেষ হইলে, কিছু অস্থি ও ছাই কানাইএর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যত্নসহকারে

একটি রৌপ্যপাত্রে ভরিয়া লইলেন। মৃতের বন্ধু ও আত্মীয়-দের মধ্যে অনেকেই কানাইএর এই শেষ স্মৃতি লইয়াছিলেন। এইরূপে কানাইলালের অদ্‌ভুত জীবনের পরিসমাপ্তি হইল।

কানাইলালের কার্য্য সম্বন্ধে তদানীন্তন কতিপয় পত্রিকার গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্যাবলী

ভারতের দেশীয় সংবাদপত্রসকল কানাইলালের কার্য্যকে ভারতের রাজনীতিক অবস্থার মাত্র একটা বিস্ময়-জনক অভিব্যক্তিরূপেই দেখিয়াছিল—আর ষ্টেট্‌স্‌ম্যান, ইংলিশ্‌ম্যান ও ডেলীনিউস প্রভৃতি ইংরাজ-শাসনের নিছক সমর্থক পত্রিকাগুলি কানাইলালের কার্য্যের নিন্দা ভিন্ন আর কিছুই করা আবশ্যক বোধ করেন নাই। এলাহাবাদের পাইওনিয়াব ইংরাজপরিচালিতসংবাদপত্রঅনুসৃত তখনকাব প্রশস্ত রাজপথ পরিত্যাগ করিয়া একটি স্বতন্ত্র পথ লওয়ায় দেশের সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। যে হেতু পাইওনিয়ারের প্রসিদ্ধ মন্তব্যগুলি একটি ঐতিহাসিক মন্তব্য বলিয়া সংবাদপত্রের ইতিহাসে স্থান পাইবার যোগ্য, সেইজন্য উহার সমগ্র মন্তব্যটি উদ্ধার করিয়া পবে উহার সমর্থক অন্য মন্তব্যগুলিও উদ্ধৃত করিব।

১৯০৮ খৃষ্টাব্দের ৩রা সেপ্টেম্বর তারিখে "পাইওনিয়ার" লিখিয়াছিলেন—রাজসাক্ষী গোসাঁইএর হত্যা সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিবার বিষয় বাঙ্গালী সাধারণের উল্লাস। গোসাঁইএর হত্যাতে তাঁহারা খুব খুসী হইয়াছেন। তাঁহারা গোসাঁইএর হত্যাকে একজন দেশের বিশ্বাসঘাতকের হত্যা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। সহরের উত্তরাঞ্চলে সকলে

উল্লাসভরে শোভাযাত্রা বাহির করিয়াছিল এবং মিউনিসিপাল মার্কেট ও লিণ্ডসে স্ট্রীটের মৎস্যব্যবসায়ীদের মত নিরক্ষর নাগরিকেরাও আজ প্রাতঃকালে গোসাঁইএর মৃত্যুতে প্রকাশ্য-ভাবে আনন্দপ্রকাশ করিতেছিল। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে অরাজকতা-পক্ষপাতী সংবাদপত্রের প্রচারসকল সফল হইয়াছে। একজন মৎস্যব্যবসায়ী গলা ছাড়িয়া বলিয়া উঠিল, "জেলের ভিতরেও আমরা—অপদার্থ বাঙ্গালীরা--কি করিতে পারি, তাহা একবার বুঝিয়া লও।" ইহার পর "পাইওনিয়ার" ৪টা সেপ্টেম্বর তারিখে নিম্নলিখিত মন্তব্য করেন। পূর্ব্বে ইহার উল্লেখ আংশিকভাবে করা হইয়াছে। "আলিপুর জেলের হত্যা সম্বন্ধে কলিকাতার কতিপয় সংবাদ-পত্র উত্তেজনার বশবর্ত্তী হইয়া যে সকল মন্তব্য করিয়াছে তাহাতে ভাষার অপব্যবহারের যে দৃষ্টান্ত পাওয়া গিয়াছে সেরূপ দৃষ্টান্ত সহজে পাওয়া যাইবে না। 'ইংলিশম্যান' ইহাকে হীন পশুজনোচিত বলিয়াছেন। অলঙ্কারের জন্য শিশুহত্যারূপ নিষ্ঠুর এবং বীভৎস অবস্থায় সম্পাদিত অন্য কোন হীন কার্য্য সম্বন্ধে এইরূপ ভাষা ব্যবহারই উপযুক্ত হইতে পারে। সকল প্রকার হত্যাই বীভৎস; কিন্তু কোনও হত্যার প্রতি যদি অল্পতমপশুত্বের আরোপ করা যাইতে পারে—আলিপুর জেলের হত্যা সেইরূপ হত্যা। 'ষ্টেট্স্‌-ম্যানের' মন্তব্য আরও অদ্ভুত। ষ্টেট্স্‌ম্যান ইহাকে কাপুরুষোচিত বলিয়াছেন—কেননা ইহা নিদারুণ অস্ত্রে

সজ্জিত ব্যক্তিগণ দ্বারা একজন নিরস্ত্র ব্যক্তিকে হত্যা 'ষ্টেটস্‌ম্যান' কি বলিতে চান যে, দুষ্কৃতকারী দুইজনের উচিত ছিল রাজসাক্ষীকে তৃতীয় রিভলবারটী দেওয়া এবং একটি সঙ্কেতের ব্যবস্থায় সম্মত হইয়া তাহাদের রিভলবারের ঘোটক চালনা করা? কিন্তু জিজ্ঞাসা করি—ষ্টেটস্‌ম্যানের ইচ্ছানুযায়ী বাঙ্গালার জেলপরিচালকগণ কি এইরূপ প্রাথমিক অনুষ্ঠানে সম্মত হইতেন? হত্যা ত দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ নয়। এইরূপ অবস্থায় যাহারা এই কার্য্য করিয়াছে তাহারা যে তাহাদের আক্রমণের পাত্রকে সতর্ক করে নাই এবং আত্মরক্ষার জন্য তাহার হস্তে কোন অস্ত্র প্রদান করে নাই, সেজন্য এই হত্যাকে নীচতাময় বর্ণে অঙ্কিত করিলে উপহাসাস্পদ হইতেই হইবে। এই কার্য্যটি কিছুতেই কাপুরু-ষোচিত হইতে পারে না। জেলখানার চতুঃপ্রাচীরের মধ্যে সম্পাদিত এইরূপ কার্য্য করিয়া পলায়নের কোন পথ ছিল না। আত্মহত্যা অথবা ফাঁসীকাষ্ঠে ঝোলা ভিন্ন অন্য পথ নাই। ইহাকে দুঃসাহসিক কার্য্য বলা যাইতে পারে, কিন্তু ইহাকে কাপুরুষোচিত বলিলে উহা অর্থহীন প্রলাপ ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। হত্যার একটি মাত্র দণ্ড থাকিলেও উহার কালিমার স্তর-ভেদ আছে এবং নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, যে হত্যায় সর্ব্বাপেক্ষা কম কালিমা থাকিতে পারে আলিপুর জেলের হত্যা সেইরূপ হত্যা। রাজসাক্ষী নিজেকে

বাঁচাইবার জন্য তাহার সহকর্ম্মীদের সর্বনাশ সাধন করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিল। যাহাতে সেসন্স আদালতে উপস্থিত হইয়া সে তাহার বক্তব্য বলিতে না পারে তাহার জন্য তাহার দুইজন সহকর্ম্মী তাহার জীবনান্ত ঘটাইতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল। প্রকৃত কথা হইতেছে-- -হয় সে থাকিবে, না হয় তাহার সঙ্গীরা থাকিবে। হত্যাকারী দুইজন অন্য সকলের জীবন রক্ষার জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিল। ইহা হত্যা, কিন্তু ইহা আত্মোৎসর্গও বটে। আইন নিঃসন্দেহে তাহার কার্য্য করিবে এবং যে গভর্ণমেণ্ট তাহার কর্মচারীদের দ্বারা রাজসাক্ষীকে রক্ষা করিতে পারে নাই সেই গভর্ণমেণ্টের বিচারবিভাগ সেই রাজসাক্ষীর মৃত্যুর প্রতিশোধ লইবে; কিন্তু নীতির আদালতে উপস্থিত হইলে আমরা আইনকে বিদায় দিব এবং কতক-গুলি অর্থহীন শব্দস্তূপে ব্যাপারটিকে আচ্ছন্ন না করিয়া উহার সত্যরূপ দেখিতে চেষ্টা করিব। আলিপুর হত্যাকে যদি আমরা নৃশংস বর্ব্বর এবং কাপুরুষোচিত বলি, তাহা হইলে কামচরিতার্থে সম্পাদিত যুবতী স্ত্রীলোকদিগের হত্যা অথবা বৃদ্ধা স্ত্রীলোকদিগকে তাহাদের সঞ্চিত অর্থের জন্য কৃত হত্যাকে আমরা কি বিশেষণে বিশেষিত করিব? ইহার পর বাঙ্গালীরা যদি হারমোডিয়াস এবং এরিস্‌টো-জাইটনের মত চরিত্রসম্পন্ন দুইজন বাঙ্গালীর দর্শন পাইয়া তাঁহাদিগকে তাঁহাদের স্মৃতিবেদিতে প্রতিষ্ঠিত করিতে

চাহেন, তাহা হইলে ইহা কি কারণে আপত্তিকর হইতে পারে তাহা বুঝিয়া উঠা সহজ নহে।

২রা সেপ্টেম্বর তারিখে "বন্দেমাতরম্" পত্রিকায় নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছিল—

বাংলাদেশে বোমা আবিষ্কারের দিন হইতে—যে বোমার কথা স্বপ্নেও কেহ চিন্তা করে নাই—একটির পর একটি করিয়া যে সকল অপ্রত্যাশিত এবং কল্পনার অতীত ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে, তাহারই সমপর্য্যায়ভুক্ত ভীষণ মর্মান্তিক ঘটনা গতকল্য আলিপুর জেলে সংঘটিত হইয়াছে। নিদারুণ মারণাস্ত্র সকল—যাহাদের বজ্রনাদ দেশের লোককে স্তম্ভিত করিয়াছে এবং যাহা প্রস্তুত করিতে এক সঙ্গে যে লোক তাহার সহকর্ম্মীদের সহিত যোগদান করিয়াছে—সেই সহকর্ম্মীদের হাতে হাতকড়া লাগাইয়া নিজেকে বাঁচাইতে যে দুঃসাহস দেখাইয়াছিল—তাহার কথা ভাবিয়া দেখিলে আমাদের মনে হয় ভবিতব্যের হাত হইতে কাহারও নিস্তার নাই। আমরা বাস্তবিকই ইচ্ছা করি যে এমন নিদারুণ বিষয়ের কথা যেন আর আমরা শুনিতে না পাই এবং ন্যায়বিচারের সীমা লঙ্ঘন না করিয়া যতশীঘ্র সম্ভব মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হউক। কতকগুলি অ্যাংগ্লোইণ্ডিয়ান সংবাদপত্র যেন ঠিকই বুঝিয়াছিল যে ম্যাজিষ্ট্রেটের ঘরে এই মোকদ্দমা অযথা দীর্ঘকাল ধরিয়া চলিতে থাকিলে কিরূপ বিপদের সম্ভাবনা সৃষ্ট হইতে পারে। আমাদের কথা এই—

আমাদের এই বিশ্বাস আছে যে ভগবান স্বয়ং এই আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া তাঁহার দ্বারা প্রবর্ত্তিত আন্দোলনকে অবাধে পরিচালনা করিয়া ইহার সাফল্যের পথ হইতে সকল বাধা অপসারিত করিবেন। পুনরায় ৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে এই পত্রিকায় লেখা হইয়াছিল—আমাদের কয়েকজন যুবকের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে কোন কপট মন্তব্য না করিয়া নীরব হইয়া থাকিবার উপদেশ 'ষ্টেট্‌সম্যান' আমাদিগকে দিয়াছেন। আমরা মনে করি যে এই সহযোগীর নিকট সমস্ত অ্যাংগ্লোইণ্ডিয়ান সংবাদপত্রের বিবেক গচ্ছিত আছে—সেই জন্য আমরা এখন তাঁহার উপদেশ অগ্রাহ্য করিলাম না। যাহা হউক আমরা ভাবিয়া দেখিব যে উপযুক্ত সাহসে ভর করিয়া ইহার পর নীরব না থাকিয়া ন্যায্য কথা বলিতে পারি কিনা। ইহার পর ১২ই সেপ্টেম্বর তারিখে সেই নীরবতা ভঙ্গ করিয়া "বন্দে মাতরম্"এ যাহা লেখা হইয়াছিল তাহারই ফলে "বন্দে মাতরম্" পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। ৩০শে অক্টোবরের পর আর "বন্দে মাতরম্" প্রকাশিত হয় নাই। "বন্দে মাতরমের" এই প্রবন্ধের নাম দেওয়া হইয়াছিল—"A traitor in the Camp" "বন্দে মাতরম্" এ লেখা হইয়াছিল—

"একজন ঘরের শত্রু বা বিশ্বাসঘাতক

এইবার স্রোত ফিরিয়াছে। এই বারই সর্ব্বপ্রথম

এমন একজন সাধক উত্থিত হইয়াছেন যিনি একজন বিশ্বাস-ঘাতককে তাহার উপযুক্ত শাস্তি দিবার জন্য স্বীয় জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছেন। কানাই নরেন্দ্রকে হত্যা করিয়াছে। অতঃপর আব কোন হতভাগা ভারতবাসী নিজ দেশের শত্রু-দিগের সহিত হাতে হাত মিলাইয়া নিজেকে প্রতিশোধ-গ্রাহীদের হস্ত হইতে নিরাপদ মনে করিতে পারিবে না। প্রতিশোধগ্রাহীদের ইতিবৃত্তে সর্ব্বপ্রথমে কানাইলালের নাম লিখিত হইবে। যে মুহূর্ত্তে কানাইএর বন্দুক হইতে প্রথম গুলি ছোঁড়া হইয়াছে সেই মুহূর্ত্ত হইতেই এদেশের আকাশ বাতাসে এই কথাটি ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইতেছে— "বিশ্বাসঘাতকের জীবনের পরিণতি দেখিয়া সাবধান হও।" বিশ্বস্তসূত্রে জানা গিয়াছে যে এই প্রবন্ধটি শ্রদ্ধাস্পদ বি. সি. চ্যাটার্জী কর্তৃক লিখিত। "বন্দে মাতরমের" এই লেখার জন্য বন্দে মাতরমের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করা হয়। বন্দে মাতরমের কাউনসিল বন্দে মাতরমের পক্ষ অবলম্বন করিয়া বলিয়াছিলেন-- "বোমার দ্বারা কখনও স্বাধীনতা লাভ করা যায় না··· দুঃখের বিষয়—এমন একটি মহৎ জীবন বৃথা নষ্ট হইল।" কিন্তু তাঁহার বক্তৃতা জজের মনে কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই।

"মাদ্রাজ টাইম্‌স্" যে মন্তব্য করিয়াছিলেন তাহাও খুব বিশেষত্বপূর্ণ। তাহা এইরূপ—

"এমন কতকগুলি হত্যা আছে যাহা আইন ও নীতি

সমর্থন করে। সৈনিক তাহার দেশের শত্রুকে যুদ্ধে হত্যা করিতে পারে, জল্লাদ প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত অপরাধীর জীবনান্ত ঘটাইলে কোন অপরাধে অপরাধী হয় না; আর আত্ম-রক্ষার্থে যে কেহ হত্যা করিতে পারে। আবার এমন কয়েক প্রকার হত্যা আছে যাহা নৈতিক অপরাধ না হইলেও আইনতঃ অবশ্যদণ্ডনীয়—অর্থাৎ উহা অপরাধ হইলেও পাপ নহে। দত্ত এবং বসু গোসাঁইকে হত্যা করিয়া যে একটি নৈতিক অপরাধ করিয়াছে—কলিকাতার অ্যাংগ্লো-ইণ্ডিয়ান পত্রিকাগুলি তাহা বড় করিয়া দেখাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন। তাহারা যে অতিশয়োক্তি করিয়াছে তাহা 'পাইওনিয়ার' চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিয়াছে। বিশেষ করিয়া কাপুরুষতা সম্বন্ধে "পাইওনিয়ার" যাহা বলিয়াছে তাহা অতি ন্যায্য কথা এবং কলিকাতার অ্যাংগ্লোইণ্ডিয়ান সংবাদ-পত্রগুলি যাহা বলিয়াছে তাহা একেবারে অন্যায্য। গোসাঁই-এর নিকট যে অস্ত্র ছিল না তাহারই উপর তাহারা বিশেষ-ভাবে জোর দিয়াছে। কিন্তু সুবিধাগুলি গোসাঁইএর অনুকূলে এত অধিক পরিমাণে ছিল যে, তাহার আততায়ীগণ ভবিতব্যের উপর নির্ভর করতঃ কর্ত্তৃপক্ষের অব্যবস্থার সুযোগ লইয়া যে কাপুরুষতার কোন কার্য্য করিয়াছে, তাহা এমন কি মধ্য-যুগের কোর্ট অফ অনারের মত কোর্টও বলিতে পারিবে না। তাহা হইলে ইহাও দাবী করা যাইতে পারে যে অপরাধী এবং তাহার জল্লাদ এই উভয় ব্যক্তিকেই অস্ত্রদান

করিয়া ফাঁসীমঞ্চে তাহাদের জয় পরাজয় নির্ণয় করিয়া লওয়া উচিত ছিল। ইহা ব্যতীত-ইহা অবধারিত যে হত্যাকারীর কার্য্যের ফল ফাঁসীকাষ্ঠ ভিন্ন অন্য কিছুই হইতে পারে না। অতএব যে ব্যক্তিগণ ধ্রুব মৃত্যুর সম্মুখীন হইয়াছিল তাহারা যে তাহাদের শত্রুদের প্রতি ব্যবহারে ভদ্রতার সকল বিধি রক্ষা করিয়া চলিবে তাহা কখনই আশা করা যাইতে পারে না। কি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হইয়া দত্ত ও বসু এই কার্য্য করিয়াছিল তাহা আমরা বলিতে পারি না। প্রতিশোধ লইবার উদ্দেশ্যে যদি তাহারা এই কার্য্য করিয়া থাকে তাহা হইলে আমরা বলিব যে তাহারা বেপরোয়াভাবে উন্মত্ত হইয়াই এই কার্য্য করিয়াছে। যদি তাহারা সহযোগীদের বিরুদ্ধে উপস্থাপিত প্রধান সাক্ষীকে ধরাপৃষ্ঠ হইতে সরাইয়া দিয়া নিজেদের বাঁচাইবার জন্য এই কার্য্য করিয়া থাকে তাহা হইলে তাহাদের এই কার্য্য আত্মবিসর্জ্জন ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। কোন অবস্থাতেই তাহাদিগকে কাপুরুষ আখ্যায় আখ্যাত করা যাইতে পারে না।"

তখনকার অবস্থার বা আবহাওয়ার প্রকৃতরূপ অঙ্কন করিয়া স্বাধীনতাবাদী "বন্দে মাতরম্" যে জ্ঞানগর্ভ সুন্দর মন্তব্য করিয়াছিল তাহা প্রকাশ করিয়া এই পরিচ্ছেদের উপসংহার করা যাউক—"দেশ আজ একটি দারুণ সন্ধিস্থলে উপস্থিত। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইলে আমাদিগের মধ্যে প্রচুর নৈতিক শক্তির বিশেষ প্রয়োজন।

দেশ-মাতৃকা খুব রুদ্র মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। আমাদের চরিত্র পরিশোধনের জন্য তিনি যে মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন তাহাতে ভয় পাইয়া আমরা যেন তাঁহার করুণা হইতে বঞ্চিত না হই। তাঁর মনের অন্ত পাওয়া অতীব কঠিন। তাঁহার লীলার অন্ত পাওয়াও সম্ভবপর নহে। ভগবান আমাদিগকে তাঁহার দুর্ব্বোধ্য রহস্যময় কার্য্য সকলের মধ্য দিয়া লইয়া যাইতেছেন। ইহার চরম পরিণতি দৃষ্ট না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা যেন আমাদের বিচার স্থগিত রাখিয়া চলিতে পারি।

"একটি বিশাল অট্টালিকার ভিত্তিস্থাপনের জন্য প্রাথমিক ভূমি সংস্কারাদি দেখিয়া আমরা ইঞ্জিনিয়ার বা আরকিটেক্টের চিন্তা ও পরিকল্পনার পরিচয় পাইতে পারি না। বুদ্ধিহীনের চক্ষু উহার মধ্যে চরম বিশৃঙ্খলার প্রতিমূর্ত্তিস্বরূপ ক্ষতচিহ্নসকল এবং আকার ও শ্রীহীন কদর্য্য কঙ্কর ও ছাই ভস্মই দেখিবেন। কিন্তু ক্রমশঃ যেমন সপ্তাহের পর সপ্তাহ অতীত হইতে থাকিবে আমরা দেখিব যে পরিকল্পনাগুলি শৃঙ্খলা ও সৌন্দর্য্যসম্পন্ন হইয়া সুস্পষ্ট ও স্থায়ী আকার ধারণ করিতেছে এবং যখন অট্টালিকাটির নির্ম্মাণকার্য্য শেষ হইবে, তখন বুঝিতে পারিব যে প্রথমে যাহা দুর্বোধ্য ও শৃঙ্খলাবিহীন বলিয়া মনে হইতেছিল তাহা আরব্ধ কার্য্যেরই অত্যাবশ্যক ক্রম। অনেক সময় প্রাথমিক ভিত্তির ধূলা কঙ্কর মধ্যে আমরা সেই সর্বশক্তিমান নির্ম্মাতার

উদ্দেশ্য বৃথা উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করি। তাঁহার উদ্দেশ্য বুঝিতে হইলে আমাদিগকে ধৈর্য্যধারণ করিতে হইবে মহান্ নির্ম্মাতার হস্তে জাতীয় জীবন-বয়ন-যন্ত্র রক্ষিত। তিনি জাতির জীবনসূত্র সংগ্রস্থিত করিতেছেন—আলোকে, অন্ধকারে যথার্থ মঙ্গল ও আপাতঃ অমঙ্গলের মধ্য দিয়া। ইহা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে তখনকার এইসকল দীপ্তিময় তেজস্বিতা-পূর্ণ উক্তি সকল দেশ ও কালেই শ্রদ্ধা পাইবার যোগ্য।”

মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্তির পর কারাগারে কানাইলালের সহিত তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীআশুতোষ দত্ত মহাশয়ের সাক্ষাৎকার

কানাইলালের দাদা শ্রীআশুতোষ দত্ত মহাশয় কারাগারে কানাইলালের সহিত তিনবার সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। প্রথম বার কানাইলাল ধৃত হইবার কিছুদিন পরে। তিনি কানাইকে জামিনে ছাড়াইয়া আনিবার জন্য গিয়াছিলেন। কানাইলাল জামিনের দরখাস্তে সহি করিতে রাজি হন নাই। আশুবাবু যে উকিলকে তাঁহার সহিত লইয়া গিয়াছিলেন তিনি বহুক্ষণ ধরিয়া বুঝাইয়াও কানাইলালকে এই বিষয়ে সম্মত করিতে পারেন নাই। দ্বিতীয়বার নরেন্দ্রনাথ গোসাঁইএর ভবলীলা সাঙ্গ করিবার পর। তৃতীয় বার ফাঁসীর দণ্ডাজ্ঞা পাইবার পর। ফাঁসী হইবার দিনকতক পূর্ব্বে যখন তিনি গিয়াছিলেন তখন তিনি কানাইএর সহিত তাঁহার মাতার দেখা করিবার কথা পাড়িয়াছিলেন। কানাইলাল বলিয়াছিলেন—কোন প্রয়োজন নাই, এখন দেখাশুনা বিষয়ে যেরূপ কড়াকড়ি হইয়াছে তাহাতে এখানে মাকে আনিয়া কাজ নাই। সেখানে যে ওয়ার্ডার তখন পাহারা দিতেছিলেন তাঁহার নিকট আশুবাবু তাঁহার ভ্রাতার করমর্দ্দন করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিলে, ওয়ারডার সাহেব পিছু ফিরিয়া দাঁড়াইয়া আশুবাবুকে

কানাইএর করমর্দন করিতে দিয়াছিলেন। তৃতীয় বার দেখা করিবার পর আশুবাবু তাঁহার সাক্ষাৎকারের কথা "বন্দে মাতরম্" দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইং-রাজিতে লেখা সেই পত্রখানির অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল—

"বন্দে মাতরম্" সম্পাদক মহাশয় সমীপে,

মহাশয়,

আমার ভ্রাতা কানাইলালের প্রাণদণ্ডাজ্ঞার সংবাদ পাইয়া গত বৃহস্পতিবার আমি তাহার সহিত দেখা করিতে আলিপুর জেলে ছুটিলাম। সাক্ষাৎকারের কথাটি সাধারণ্যে প্রকাশ করা উচিত মনে করিয়া আমি আপনার পত্রিকার কোন এক স্থানে উহা প্রকাশ করিতে অনুরোধ করিতেছি। জেল কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আমার আবেদন উপস্থাপিত হইলে আমাকে জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের সহিত তাঁহার বাংলোয় দেখা করিতে নির্দ্দেশ দেওয়া হইল। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আমার প্রতি খুব ভদ্রভাব দেখাইয়া ঘটনার জন্য দুঃখপ্রকাশ করিলেন। আমার আবেদনে আমি আমার মাতার পক্ষ হইতে বন্দি কানাইলালের সহিত নিরালায় সাক্ষাৎ করিতে চাহিয়াছিলাম, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট উহা পাঠ করিয়া বলিলেন যে তিনি বড়ই দুঃখিত যে তিনি ঐরূপ কোন অনুমতি দিতে পারেন না; কিন্তু আমাকে জেলের দ্বারদেশে তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতে বলিলেন। প্রায় তিন ঘণ্টা অপেক্ষা করিবার পর তিনি আসিয়া জেলারকে আবশ্যক

নির্দ্দেশাদি দিলেন এবং জেলার আমাকে ভিতরে লইয়া গেলেন। জমাদার আমার নাম লিখিয়া লইল এবং জেলার নিজে আমার তল্লাসী লইলেন। ইহার পর দুইজন জেলার এবং দুইজন রক্ষী আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন। বৃহৎ প্রাঙ্গণের এক দিকে এক একজনের জন্য বাসোপযোগী কয়েকখানি কক্ষ লইয়া এক সার সুরক্ষিত কক্ষ অবস্থিত। আমাদের সামনে একটি বড় দরজা খুলিয়া গেল এবং আমরা ভিতরে প্রবেশ করিলাম। আমার ঠিক দক্ষিণে অবস্থিত প্রথম কক্ষটিতে আমি দেখিলাম যে কানাই পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের ন্যায় পাদচারণা করিতেছে। তাহার নিকট চশমা ছিল না বলিয়া সে দর্শকদিগকে চিনিতে পারিল না, কিন্তু সে না ঝুঁকিয়া সোজাভাবে আমার দিকে চাহিয়া দেখিল। আমি সবেগে তাহার দিকে যাইয়া তাহার কক্ষের গরাদে স্পর্শ করিতে না করিতেই রক্ষীকর্ত্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হইলাম এবং আমাকে দুই হাত সরিয়া আসিয়া দাঁড়াইতে হইল। কিন্তু কানাইএর মুখের দিকে চাহিয়া কি দেখিলাম—স্বল্প পরিচ্ছদ পরিহিত দেহে তাহার মুখশ্রী কেমন উজ্জ্বল ও সুন্দর দেখাইতেছিল। সে মৃদু হাসিয়া তাহার জীবনে শেষবার মুক্তভাবে আমার সহিত কথা বলিতে লাগিল। ইহা অপ্রত্যাশিত বলিয়া আমি ইহাতে নির্ব্বাক হইয়া রহিলাম। তাহার মুখখানি কত শান্তি ও সন্তুষ্টিতে ভরা। যে আশা ও শান্ত্বনার কথা আমার বলিবার ইচ্ছা

ছিল তাহা আমি ভুলিয়া গেলাম এবং তাহার জন্য আমার উদ্‌বেগ ও দুঃখের কথাও সমস্ত ভুলিয়া গেলাম। তাহার কাজ সে করিয়া যেন নিশ্চিন্ত হইয়াছে—এইভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া সে আমাকে আগ্রহসহকারে জিজ্ঞাসা করিল যে তাহার মৃত্যুর দিন কি স্থির হইয়াছে? সে কেমন আছে জিজ্ঞাসা করায় সে উত্তর দিল যে সে খুব ভালই আছে এবং তাহার অভিযোগ করিবার কিছুই নাই। আমাকে—যতটা পারা যায়—মাকে সান্ত্বনা করিতে বলিল এবং তাঁহাকে জেলে আনিতে নিষেধ করিল—কেন না এখন যেরূপ তল্লাসীর ব্যবস্থা হইয়াছে তাহা তাঁহার পক্ষে অসহ্য হইতে পারে। তা ছাড়া তাঁহাকে নিরালা দেখা করিতে দিবে না। তাহার বন্ধুদের সহিত সে দেখা করিতে চাহে কিনা জিজ্ঞাসিত হইলে সে উত্তর করিল, "হাঁ, যদি কর্ত্তৃপক্ষ অনুমতি দেয়।" কানাইএর চশমা আমাকে দিতে পারেন কিনা একথা আমি জেলারকে জিজ্ঞাসা করিলে, কানাই বলিল যে ফাঁসীর সময় উহা তাহার দরকার হইবে। আমার যেন মনে হইতেছে যে সে সেই সময়ে কিছু পড়িতে চাহে এইরূপ উক্তি করিয়াছিল। আমি তাহাকে দৃঢ় থাকিতে বলিলে সে মৃদু হাস্য করিল। আমি জনমের মত সতৃষ্ণ নেত্রে তাহার দিকে চাহিলাম। তাহার সুন্দর মুখমণ্ডলে কি শান্তিপূর্ণ সন্তুষ্টির ছবি দেখিলাম। আমি তাহাকে আমার ও মার আশীর্ব্বাদ জানাইলাম।

ধন্য ধন্য বীর যুবা! ভয় কাহাকে বলে সে এক মুহূর্ত্তের জন্য জানিতে পারিল না। সে পুনরায় মাকে সান্ত্বনা করিতে বলিল। আমি পুনরায় তাহার দিকে চাহিয়া দেখিলাম এবং যে ভাব লইয়া ভাই ভাইকে তাহার শেষ দিনের সম্মুখীন হইতে দেখিতে পারে, সেই ভাব লইয়া তাহার নিকট হইতে শেষ বিদায় লইলাম।

চন্দননগর বিশ্বস্ত আপনার—

১৬ই সেপ্টেম্বর ১৯০৮ এ. দত্ত। এল. এম. এস।

কানাইলালের বড় দুঃখের একটি মর্ম্মছেঁড়া কথা

নরেন্দ্রনাথ গোসাঁই নিহত হইবার কিছুদিন পূর্বে আলিপুর জেলে আবদ্ধ সন্ত্রাসধর্ম্মী বিপ্লবীগণ নিজেদের কার্য্যের আপাতনিস্ফল পরিণতির কথা অনুধাবন করিয়া বড়ই চঞ্চল ও অস্থির হইয়া উঠিয়াছিলেন। কি করিয়া নিরাশার কর্ম্মভূমিকে পুনরায় নবতর আশা ও উৎসাহে সঞ্জীবিত করিয়া উহার দীর্ঘায়ু সম্ভবপর করিতে পারা যায় তাহার উপায় উদ্‌ভাবনবিষয়ে তাঁহারা চিন্তা করিতেছিলেন। শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ এবং শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহাদের কর্ম্মবৃত্তান্ত পুলিশের নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন। কানাইলাল তাঁহাদের এই কার্য্যের যৌক্তিকতা ভালচক্ষে দেখিতে পারেন নাই। কারারুদ্ধ সন্ত্রাসসৃষ্টিকারীগণ অধিকতর একটি বীরত্বপূর্ণ কার্য্য করিয়া দেশবাসীকে আশান্বিত এবং তৎসঙ্গে শাসকবর্গকে চমকিত ও সন্ত্রস্ত করিবার কার্য্যে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। তাঁহারা হয় নিজেরা অথবা শ্রীঅরবিন্দ বাবুর পরামর্শানুযায়ী স্থির করেন যে তাঁহারা কোনরূপে জেলখানা হইতে পলায়ন করিয়া হয় বাহিরে কোন পার্ব্বত্য অঞ্চল হইতে অসংবদ্ধ (guerilla) যুদ্ধ সুরু করিয়া দিবেন, না হয় একেবারে ইংরাজ অধিকারের বাহিরে চলিয়া যাইবেন। এই উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য তাঁহারা কিছুদূর অগ্রসরও হইয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন যে তাঁহাদের এই কার্য্যে সাহায্য করিবার জন্য তিনি বাহির হইতে কয়েকবার জেলের ডাক্তারের সহায়তায় জেলের সদর দরজার চাবিকলের কয়েকটি মোমের ছাঁচও সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই সংকল্প কার্য্যে পরিণত হইবার পূর্বেই গোসাঁইবধ সংঘটিত হইলে সংকল্পটি পরিত্যক্ত হয়।

গোসাঁইবধের জন্য জেলের ভিতর রিভলবার প্রবিষ্ট করাইবার সময় যখন বসন্তবাবু কানাইলালের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন তখন বড়ই দুখের সহিত কানাইলাল বসন্ত বাবুর নিকট জেলের ভিতর আবদ্ধ বারীন্দ্রকুমার প্রভৃতিদের উদ্দেশে কিছু কঠোর ভাষা প্রয়োগ করিয়াছিলেন—ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে তিনি বারীন্দ্রকুমার প্রভৃতিদের সহিত সর্ববিষয়ে একমত ছিলেন না।

শেষ কথা

কানাইলালের সংক্ষিপ্ত জীবন-কথা অবলম্বন করিয়া যে সকল বিষয়ের আলোচনা করা হইল, আমার বিশ্বাস, উহা দেশে বিদেশে আগ্রহসহকারে পঠিত ও উপলব্ধ হইবে। স্বদেশের রাষ্ট্রক্ষেত্রে কানাইলাল তাঁহার সহ-কর্ম্মীদের সহিত যে সৃষ্টিসম্ভাবনার ভিত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন তাহা এখন স্বাধীনতার হাওয়ায় বৃদ্ধি ও সমৃদ্ধি আনিবার পথে আগুয়ান। তাই কানাইলালের আগমন, অবস্থান ও বিদায় গ্রহণ বাঙ্গালীর তথা ভারতের ইতিহাসে একটি উজ্জ্বল অধ্যায়রূপে চিরকাল বিরাজ করিতে থাকিবে। কানাইলাল ও তাঁহার সহকর্ম্মীদের দ্বারা আরব্ধ বৈপ্লবিক কার্য্যসকল ১৮৫৭ সালের সিপাহী যুদ্ধের কার্য্যাবলীর সহিত তুলনা করা যাইতে পারে এবং শেষোক্ত যুদ্ধের ব্যাপ্তি বিশাল তর হইলেও বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বাঙ্গালীর তথা ভারতবাসীর বিপ্লব-প্রচেষ্টা নিশ্চয়ই অধিকতর অর্থপূর্ণ এবং সাহসিকতা ও বীরত্ব ব্যঞ্জক। বাঙ্গালীর অহঙ্কার লইয়া আমি এই উক্তি করিলাম না, কিন্তু ইহা নিছক সত্য বলিয়া অকপটে ব্যক্ত করিলাম। প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা স্বীয় নিজস্ব দীপ্তিতে দীপ্তিমান হউক---সকল ঐতিহাসিকের নিকট ইহাই বাঞ্ছনীয় হওয়া উচিত। ভারতবাসীর বহু-দিনের এবং বহুজনের সাধনা ও চিন্তার পরিণতি হিসাবে

বাঙ্গালায় কতকগুলি—কতকগুলি কেন বহু—বীর সন্তানের আবির্ভাব সম্ভবপর হইয়াছিল। প্রাকৃতিক ভূকম্পনের মত উহা বাঙ্গালার বিভিন্ন অঞ্চলে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল এবং একাধিক ক্ষেত্রে উহার জয় গান গাহিবার সুযোগও দেশবাসী পাইয়াছিলেন। প্রাকৃতিক বিপ্লব অধিকাংশ ক্ষেত্রে ধ্বংসলীলা করিয়াই সমাপ্ত হয়, কিন্তু মনুষ্যসমাজের এই বিপ্লব অধিকাংশ ক্ষেত্রে নূতন সৃষ্টির সম্ভাবনা লইয়া দেখা দেয়। আজ দিন আসিয়াছে সর্ব্বপ্রকার প্রাদেশিকতা বর্জ্জন করিয়া প্রকৃত বীরত্ব ও জ্ঞানের পূজা ও সাধনায় সমবেত হইবার। আমরা যে-কোনো আদর্শকেই অনুসরণ করিয়া চলি না কেন, আমাদিগকে সকল বিষয়ে একটী সর্ব্বভারতীয় আদর্শের পদমূলে সর্ব্বপ্রকার প্রাদেশিকতা বলি দিতেই হইবে। যদি সকল ক্ষেত্রে প্রকৃতপক্ষে জীবন সঞ্চারিত করিতে হয়, তাহা হইলে ইহা ভিন্ন আর অন্য পন্থা নাই।

ইংরাজ শাসকগণ শাসন ব্যাপারে যে সকল বড় বড় ভুল করিয়া চলিতেছিলেন সে সকল ভুল যদি তাঁহারা না করিতেন তাহা হইলে এত শীঘ্র হয়ত বৈপ্লবিক অবস্থার সৃষ্টি হইত না। তাঁহারা ধারণা করিতে পারেন নাই যে মাত্র মস্তিক-চালনা-প্রিয় বাঙ্গালী তাহার দেহ মন সমস্তই দেশের কাজে সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হইতে পারেন। তাই তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন, দমন নীতির আস্বাদ

পাইলেই নেতারা পলায়নপর হইবেন। কিন্তু তাহা না হইয়া দেশভক্তগণ গাহিলেন—"ওদের বাঁধন যত শক্ত হবে, মোদের বাঁধন তত টুটবে।" কিন্তু দুষ্ট ইংরাজ ভারত ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার সময় যে মর্ম্মান্তিক বিদায়-পদাঘাত করিয়া গিয়াছেন তাহার জ্বালা হইতে আমরা কোনো কালে নিষ্কৃতি পাইতে পারিব কি? ইংরাজকে তাহার বিগত শাসনের ভেদনীতির জন্য আমরা গালি পাড়িতাম, কিন্তু আমরা বাস্তব ক্ষেত্রে ইংরাজ-ব্যবস্থিত সেই ভেদনীতির সমর্থক হইয়া স্বাধীন হইতে সম্মত হইলাম। কাহার পাপে এই বিধান জয়ী হইল কে তাহা নির্ণয় করিবে?

বিপ্লবীরা যাহা করিয়া গিয়াছেন তাহার জন্য তাঁহারা প্রত্যেক ভারতবাসীর শ্রদ্ধা ভক্তি পাইবার অধিকারী। ফাঁসীদণ্ড-প্রদানকারী বিচারক যখন কানাইলালকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি তোমার দণ্ডের বিরুদ্ধে আপিল করিবে কি?" কানাইলাল তৎক্ষণাৎ উত্তর করিয়াছিলেন "There shall be no appeal" "আপীল হইবে না"। কানাইলালের মুখ-নিঃসৃত এই সোজা স্পষ্ট উত্তরটি ভারতের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবার যোগ্য। কানাইলালের এই উক্তি কোনকালে ভুলিবার নয়। কানাইলালের চিত্ত তখন উদ্‌বেগ ভাবনা হীন, জন্ম মৃত্যু তখন কানাইলালের পায়ের ভৃত্য। মরিব আমরা সকলেই, কিন্তু কানাইলালের মত চিত্ত লইয়া মরিবার সৌভাগ্য আমাদের কয়জনের হইবে?

বিদেশী শাসনরূপ একটি ভূত আমাদের দেশের স্কন্ধ হইতে নামিয়া গিয়াছে, কিন্তু একথা কি সত্য নয় যে স্বদেশী ভূতেরাই আমাদের পরাধীনতা আনিয়াছিল এবং এখন আমরা রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে স্বাধীন হইলেও সে স্বাধীনতাকে অনেক স্বদেশী ভূতে আবার নানা দিক হইতে অর্থহীন করিয়া তুলিতে চাহিতেছেন। কবে আমরা শিখিব যে নিজেদের আত্মার অধীনতা পরাধীনতা নহে। আমরা নিজেরাই নিজেদের বন্ধু, নিজেরাই নিজেদের শত্রু। ইহাই ভারতীয় সংস্কৃতির দান। এই নির্ম্মল নির্জ্জলা সত্যকে জপমালা করিয়া প্রত্যেক দেশকর্ম্মী যেন দেশের সেবা করিয়া যাইতে পারেন। আমাদের অতীতের মত অতীত কোন দেশেরই নাই। বর্ত্তমানে আমাদের কার্য্য হইতেছে ভবিষ্যতকে অধিকতর গৌরবময় করিয়া তোলা।

বন্দে মাতরম্।